বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বনাম জনবিজ্ঞান

ভরদারাজনকে খোলা চিঠি

ভূপালের ডায়েরী—চিকিৎসাচিত্র

ভূপাল সম্ভাবনা—দেশে দেশে

মালটিন্যাশনাল মেজাজ

আমি প্রযুক্তি বলছি

ড্রাগ কনভেশন—যা মনে হ'ল

হেপাটাইটিস আসছে

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1985

দাম দু' টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1985

বি-ও-বি'র কথা ☐ ভূপালের আলোয় প্রযুক্তির বিচার ঃ ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বনাম জনবিজ্ঞান—মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ☐ প্রিয় ডক্টর ভরদারাজন— অনিল সদগোপাল ও এ. কে. রায় ☐ ভূপালের ডায়েরী ঃ চিকিৎসাচিত্র- ডাঃ সুজিত কুমার দাশ ☐ ভূপাল সম্ভবনা দেশে দেশে—সংকলন ☐ ভূপাল দুর্ঘটনা কলকাতার কার্বাইড ও মালিটন্যাশানাল মেজাজ—রবীন চক্রবর্তী ☐ আমি প্রযুক্তি বলছি—ডক্টর বিচক্ষণ ☐ ড্রাগ কনভেশন ঃ যা মনে হল— নিজস্ব প্রতিবেদক ☐ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র—নিরঞ্জন বিশ্বাস ☐ এবার কি তবে হেপাটাইটিস মহামারী ☐ পত্রিকা পর্যালোচনা ☐ রিপোর্ট ☐ প্রচ্ছদ—অতি দাস

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বার টাকা ☐ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা ☐ বাংলাদেশের জন্য —ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা ☐ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা- বার্ষিক কুড়ি ডলার ☐ এজেন্ট কমিশন ঃ দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ ☐ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা–700012 ঠিকানায় দোতালায় ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজের ঘর ☐ প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-9 (শুকিয়া ষ্টীটে ঢুকে খোঁজ করুন) ☐ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্টলেক, কলকাতা-700064।

বি-ও-বি'র কথা

গত বারই মার্চ আন্তর্জাতিক ভূপাল দিবস পালিত হল ভারতের ও অন্যান্য দেশের বহু জায়গায়— তার সঙ্গে কলকাতায়ও। বড় মিছিল হল, ধিক্কার-সমাবেশ হল, অংশগ্রহণ করল অনেক জনবিজ্ঞান সংগঠন, সাংস্কৃতিক গ্রুপ, ট্রেড-ইউনিয়ন, গণসংগঠন। ঐদিনই পূর্ণ হল ভূপাল দুর্ঘটনার একশ দিন।

তার আগে তিন মাস ধরে পশ্চিমবাংলার বহু জায়গায়, স্কুল-কলেজে, পাড়ার ক্লাবে, নানান সংগঠনের তরফে অনেকগুলি সেমিনার, সমাবেশ, পোস্টার প্রদর্শনী, প্রচার অভিযান, পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির উদ্যোগ দেখেছি আমরা। সাম্প্রতিককালের ভিতর কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এত ব্যাপক প্রচেষ্টা ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখা যায় নি এ রাজ্যে। কোনো বড় রাজনৈতিক দলের বা সরকারী পরিকল্পনায় সংগঠিত হয় নি এইসব প্রোগ্রাম। রাজনৈতিক দল, বড় ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার, এইসব পক্ষ বরং দর্শনীয় নীরবতার সাক্ষ্য রেখেছে এ প্রসঙ্গে। অনেক দিনের কৌশলী অভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ তারা। সেদিক দিয়ে বোকাই বলতে হবে ঐসব কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলিকে, ছোট ছোট গ্রুপগুলিকে, যারা অতিসামান্য 'নো-হাউ' আর 'রিসোর্স' কিন্তু অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে ছোটাছুটি করে অনেক সময় 'নষ্ট' করল ভূপাল নিয়ে। কষ্ট করে টাকা যোগাড় করে ভূপাল চলে গেল জহেরিলী গ্যাস কান্ড মোর্চার ডাকে। দুপুর রৌদ্রে পাড়ায় পাড়ায়, রেল স্টেশনে পোস্টার টাঙিয়ে লোকের কাছে তুলে ধরতে চাইল 'ভূপালের শিক্ষা'।

আজকের দিনের 'রিয়াল পলিটিক'-এ এদের জায়গা কোথায়? মানুষজনই বা এদের কথা শোনে কই। হয়ত কিছুক্ষণ দাঁড়ায় স্ট্রীট কর্ণার মিটিং-এ, খুব বেশী হ'লে আলগা করে চোখ বুলায় লিফলেটের পাতায়। তার পর ঢুকে পড়ে যে যার জীবন-জীবিকা-আমোদ-প্রমোদ-সমস্যা-সংকটের আবর্তে। উৎসাহী ছেলে মেয়েদের চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে যায়। তার পরে আসে বর্ন্যা, না হ'লে খরা, আন্ত্রিক রোগ, আর না হয়ত আর একটা ভূপাল···। আবার সমাবেশ, পোস্টার তৈরী, কাঁধে নিয়ে এখানে ওখানে ছুটো-ছুটি। অ্যান্ডারসন, অর্জুন সিং বা রাজীব গান্ধীর হাতে তখন হয়ত অন্য প্রোগ্রাম।

অনেককে একটু বিরক্ত হয়েই বলতে শুনেছি, ভূপাল ভূপাল করে এত চেচামেচিতে লাভটা কি হচ্ছে, একঘেয়ে বিরক্তিকর কথার পুনরাবৃত্তি আর ভাল লাগে না। আমার বেশীর ভাগ মানুষই বোধ হয় এরকম কথা বলি নিজেদের উদাসীনতা, উদ্যোগহীনতাকে আড়াল করার জন্য। একদল ছেলেমেয়ে যখন ভূপালের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে জানতে চাইছে মানুষজনের অবস্থা, আমরা তখন হয়ত বা ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি—এই বৈপরীত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য। তবে তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করা ভাল, ভূপাল নিয়ে যেসব আন্দোলন, প্রচার ইত্যাদির কাজ হচ্ছে তার ভিতর সত্যিই বোধহয় আর একটু মৌলিকতা এলে ভাল হয়। গোড়ায় যে ধরনের প্রচার প্রয়োজন ছিল, এখন আর তাতে বিশেষ কাজ হবে না। প্রথমত, শুধু যদি ভূপালের মানুষজন, পরিবেশের কথা ধরি, তা'হলে জনবিজ্ঞানের সমর্থক কর্মীদের সেখানে উপস্থিত থেকে, সময় দিয়ে গবেষণামূলক কাজ করতে হবে, সম্ভাব্য দীর্ঘকালীন ক্ষতিগুলিকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে হবে, সেই অনুযায়ী প্রচার সংগঠিত করতে হবে। সরকারী আমলা, ওপরতলার বিশেষজ্ঞ অথবা সর্বভারতীয় ম্যাগাজিনের তথ্যের উপর নির্ভর করলে এক এক সময় এক এক বক্তব্যের গোলকধাঁধায় ঘুরতে হবে। আমরাই বি-ও-বি'র পাতায় কাল লিখেছি ফসজিন, আজ লিখছি 'মিক'। এর থেকে বেরোনর দরকার আছে।

এর পর, ভূপালের সূত্র ধ'রে যদি আরো ব্যাপক পরিসরে ভাবতে চাই, আজকের শিল্প বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উন্নয়ণ এর গোটা কাঠামোটারই বিকল্প চিন্তা যদি তুলতে চাই, তবে দেখব আমাদের আশপাশের নানান নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ধরে গবেষণা-মূলক কাজের প্রয়োজন আরো বেশী। ঠিক এই জিনিষটাই কিন্তু আমরা করছি না। কারণ আমাদের মাথায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আন্দোলনের যে ছকটা গেঁথে দিয়েছে তাতে গবেষণার কোনো স্থান নেই। গবেষণা মানেই সেখানে এলিটিজ্‌ম। একবার ভেবে দেখার দরকার আছে, আন্দোলনকারীদের নিজস্ব গবেষণার এত অভাব বলেই আজ আন্দোলন ঘুরে মরছে একই বৃত্তের পাকে। কারণ আসল ব্যাপারগুলিতে সব সময় আমাদেরকে পরের মুখের ঝাল খেয়ে চলতে হচ্ছে। আমাদের কাছে গবেষণা বলতে এখন শুধু একশ বা হাজার বা দশ হাজার মানুষের কাছে গিয়ে 'সার্ভে' করা, অথবা দুটো স্ট্রীট করনারিং-এর মাঝে কয়েকটা বই কনসাল্ট করে নেওয়া। এগুলিরও দরকার আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি দরকার আছে ভূপালের মানুষের, গাছ-গাছড়ার সম্ভাব্য জেনেটিক পরিবর্তন-গুলোকে ধরা, খরদা-রিষড়ার রাসায়নিক কারখানার যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি আয়ত্ত করা, সেখানকার দূষণের সমস্ত রাসায়নিক তথ্য সংগ্রহ করা। শুধু গবেষণাতেই যে কাজ হবে না, একথা বলার দরকার পড়ে না। 'কাজ' হাওয়ার আরো অনেক পূর্বসর্ত আছে। কিন্তু গবেষণাটা দরকার। না হ'লে শেষ পর্যন্ত সেই পেঙ্গুইন পেপারব্যাক। আর কনসুলেটের সামনে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচানো 'সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালরা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক'।

আর, তখন ভূপালের ঘটনায় আমরা যারা মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের অভ্যস্ত গভীর ভিতরও একটু নাড়া খেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মিছিলের পাশে, একঘেয়ে বক্তৃতা আর শ্লোগান শুনে আবার ফিরে যাবো যে যার নিজেদের জীবনের ছকে।

——

ভূপালের ঘটনা বলছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়াকার প্রশ্ন আর এড়িয়ে থাকা যাবে না। ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে যে 'উন্নয়ন' আসে তার সঙ্গে সুস্থ পরিবেশ সুস্থ জীবনের বিরোধ মৌলিক। ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান 'প্রকৃতির প্রজ্ঞা'য় আস্থাশীল হতে পারে না। বিকল্প—জনবিজ্ঞান।

ভূপালের আলোয় প্রযুক্তির বিচার ঃ ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বনাম জনবিজ্ঞান

মণীন্দ্র নারায়ন মজুমদার

ভূপালের 'কেমিকাল ফল-আউটের' তাৎপর্য বহুমুখী ও সুদূর-প্রসারী। মানুষের অধিকার থেকে উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রশ্নই এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। ভারতের উন্নয়নের ধারা দেখে এ ধারণা করার সঙ্গত ভিত্তি আছে যে সমাজের উপরতলার কিছু লোক এক ধরনের উন্নয়নের কিছু সুফল পেলেও জনসাধারণের ব্যাপক অংশ পাচ্ছে তার দূষণ। ভারতীয় সমাজের ব্যাপক অনুন্নত অংশের অতি নগ্ন দারিদ্র্য-দূষণের উপরে ক্রমাগত চাপছে পাশ্চাত্যের বিকৃত শিল্প-বিজ্ঞান জনিত দূষণ। দুই বিশ্বের খারাপ এড়িয়ে সত্যকার উন্নয়ন কিভাবে হতে পারে, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা একই সঙ্গে ঘটতে পারে, তার জন্যে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান নামে আজ যা প্রচলিত তার থেকে কিছু ঝাড়াই বাছাই করে "জনবিজ্ঞান বা পিপলস্ সায়েন্স" নামে বিশেষ গুণ ও চরিত্রবিশিষ্ট যে বিজ্ঞান—আরো সঠিকভাবে প্রযুক্তি, তা চিহ্নিত করার প্রয়াস এখানে রাখা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক নব্যব্যবস্থার সাথে তাল রেখে আধুনিক বিজ্ঞান যে শক্তি ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে তার বিকৃত ও বিধ্বংসী চরিত্র দেখেই জনবিজ্ঞানের ধারণাকে বিকশিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তি শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়। ধনতান্ত্রিক প্রযুক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বৈষম্য সৃষ্টি করে বিপ্লবের সুফলকে বিনষ্ট করবে। অপরপক্ষে জনবিজ্ঞান শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সুস্থ পরিবর্তনের সহায়ক হবে। জনবিজ্ঞান শ্রমজীবী জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতায় পুষ্ট, এতে প্রকৃতির অনবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম, নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বেশী। জনবিজ্ঞান ক্ষমতা ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষুদ্রায়নের অনুকূলে কাজ করে এবং পরিবেশ দূষিত করে কম। এককথায় জনবিজ্ঞানের বিশেষত্ব হবে ঃ সামাজিক ন্যায় বিচার বাড়ানো, পরিবেশের সুরক্ষা, প্রকৃতির নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন ঘটানো এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

একই রকম অভীষ্ট সাধনের জন্য ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান ব্যবহার না করে জনবিজ্ঞানের পথ ধরলে ব্যাপক জনসাধারণ উপকৃত হয়, পরিবেশও সংরক্ষিত হয়। স্টকহোম ঘোষণাপত্রে (1972) যথার্থই বলা হয়েছে, পরিবেশের প্রয়োজন ঃ ইকো-উন্নয়ন ও মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি (10 নং ধারা); পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন সম্ভব (13নং ধারা), পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে (14 নং ধারা)। একটু বিচার করলেই দেখা যাবে এই বিজ্ঞান প্রচলিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নয়। এর একটা বড় কারণ ঐ বিজ্ঞান মূলতঃ ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি নির্ভর। এবং এর উদ্ভব ও বিকাশ মূলতঃ মুনাফা ও যুদ্ধের প্রয়োজনে।

ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও জনবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিচের সারণী থেকে স্পষ্টতর হবে আশা করা যায়।

সারণী —1

উদ্দেশ্য	উপায়	
	ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান	জনবিজ্ঞান
1. কৃষি উৎপাদন	উচ্চফলনশীল বিজাতীয় বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, পাম্পসেট, কৃষি মেসিন, বড় জোত, অধিক বিনিয়োগ	ক্রমোন্নয়ী প্রচলিত বীজ, জৈব সার, সেচ, চাষীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সার্বিক কৃষি উন্নয়ন
2. পেস্ট কন্ট্রোল	পরিবেশের সাথে রাসায়নিক যুদ্ধ	সঠিক কৃষি পদ্ধতি, বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোল
3. শক্তি উৎপাদন	তাপ-বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, বড় ড্যাম, পরমাণু-বিদ্যুৎ	মিনি ও মাইক্রো-ড্যাম, তাপবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস, পেশী শক্তি
4. বন্যা নিয়ন্ত্রণ	নদী পরিকল্পনা ও বড় বাঁধ	বন সৃজন, মাটির সবুজ আস্তরণ বৃদ্ধি ও ক্ষেতের আলের সাহায্যে ভূগর্ভে জল সংরক্ষণ
5. পরিবহণ	হাইওয়ে ও অটোমোবাইল, প্লেন, রেল	রেল, নৌ পরিবহন, পেশী শক্তি চালিত শকটাদি
6. শুচি ব্যবস্থা	ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, কেন্দ্রীভূত জারণ ও উদ্ভিদের অজৈব পুষ্টির জলে বিনষ্টি	দেহ ও গৃহ-বর্জ্য গৃহ বা গৃহসমষ্টিতে সংগ্রহ, অবায়বীয় জারণ, বায়োগ্যাস ও জৈব সার সংগ্রহ, মৎস্য উৎপাদন
7. পরিধেয়	টেরিলিনাদি কৃত্রিম তন্তু	সুতি, রেশম, উল
8. লণ্ড্র	ডিটারজেণ্ট সাবান, প্রাকৃতিক ডিটারজেণ্ট	

উপরোক্ত দ্বিবিধ বিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সহজসাধ্য না হলেও যাদের ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে কিছু ধারণা আছে তাঁরা উভয়ের প্রায় বিপরীতমুখী প্রবণতা ও ঝোঁক লক্ষ্য করবেন। প্রতিটি প্রযুক্তি এবং সমাজ ও পরিবেশে তাদের প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে আলোচনা হলে বিজ্ঞানের চরিত্রবিচার কতটা সঙ্গত তা স্পষ্টতর হবে। শক্তি—ফ্রি এনার্জি—একটি মৌলিক ব্যাপার। প্রযুক্তিতে শক্তি ব্যয় এর চরিত্র বিচারের এক বড় মাপকাঠি। খাদ্যশস্য, কয়লা, খনিজ তেল বিভিন্ন আকারে শক্তি উৎপাদন ও স্থান থেকে স্থানান্তরে সরবরাহের মাধ্যম।

বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অবিজ্ঞান ঃ

এবারে প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিকে একটু তাকানো যাক। আমরা দুটি বড় বিষয় নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করবো। পরমাণু বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও বোধকে গভীর ও ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করলেও, পরমাণু প্রযুক্তি সম্বন্ধে কিন্তু একই কথা ভাবা যাচ্ছে না। এই প্রযুক্তির জন্ম যুদ্ধের প্রয়োজনে, ধনতন্ত্রের ক্রোড়ে। এর পক্ষে পরিবেশ বিপন্ন না করে মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ তাপবিদ্যুতের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশী। এতে দুর্ঘটনা প্রায়শঃই হয় এবং বড় রকম দুর্ঘটনার ঝুঁকি কোন অবস্থাতেই এড়ানো যায় না। হ্যারিসবার্গ সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। ভূপাল যেমন দিয়েছে সংশ্লেষ রসায়ন ও কীটনাশক রসায়ন শিল্প সম্বন্ধে। সর্বোপরি, এর মাধ্যমে তাপদূষণ বেড়ে চলে। ব্যাপকভাবে পরমাণু ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন ও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর সম্ভাবনা বাড়ানো প্রকৃতির ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃতির ব্যবস্থাই এমন যে পারমাণবিক বিক্রিয়া পৃথিবীর বাইরে সূর্যে বা নক্ষত্রে হবে এবং সেখান থেকে নির্গত শক্তি উদ্ভিদের মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রয়োজন মেটাবে। এটা ঘটনা যে পৃথিবীতে প্রায় দুশো কোটি বছর আগে তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা যথেষ্ট কমে যেতেই জীবন আত্মপ্রকাশ করতে পারলো, তাও প্রথমে সমুদ্রের তলে। তাই মেদিনীপুরের কাদিরাবাদে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না।

ইকোলজির চার সূত্র ঃ সংশ্লেষ রসায়ন শিল্প মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, এটা বিচারের জন্য ইকোলজির প্রাথমিক চারটে সূত্র স্মরণ করা ভালো।

(1) সব জিনিসই অন্য সব জিনিসের সাথে সম্পর্কিত।

(2) যে কোন জিনিসকে শেষ পর্যন্ত কোথায়ও না কোথায় যেতে হবেই।

(3) প্রকৃতিই সবচেয়ে ভালো জানে।

চলো চড়ে রেলবাসে দীঘা

মাতঙ্গিনী রেল-বাস সার্ভিস।
হাওড়া স্টেশন থেকে প্রতিদিন সকাল ৬টা ৫৩-এ। দীঘায় পৌঁছে দিচ্ছে ১০টা ৫০-এ। আবার সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টা ৪০-এ কলকাতায়। মেচেদা পর্যন্ত ট্রেনে তারপর বাসে। একদিকের রেল বাসের ভাড়া মাত্র ১৫টাকা। যাওয়া এবং ফিরে আসার জন্য যোগাযোগ করুন কাউন্টার-১১, হাওড়া স্টেশন।

S.E.RAILWAY

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

CONTAD/SER/5-84 BEN

(4) বিনিপয়সায় ভোজ মেলে না।

টেকনোলজি কোন কিছু উৎপন্ন করে না, রূপ পরিবর্তন করে মাত্র। গম থেকে বিস্কুট, বাঁশ, কাঠ, তুলো থেকে কাগজ বা রেয়ন বস্ত্র এসব "বিনিপয়সায়" হয় না (4নং সূত্র)। শক্তি খরচ হয়। এই ধার শোধ দিতে সময় কিছু নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ফেরৎ দিতেই হবে। রাসায়নিক দূষণের ভিত্তি হল 1 ও 2নং নীতি; 3নং নীতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক, এর মধ্যে অধ্যাত্মবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী প্রবণতা খোঁজা ভুল।

প্রকৃতির প্রজ্ঞা ও সংশ্লেষ রসায়ন শিল্প ঃ

প্রকৃতির প্রজ্ঞার ভিত্তি ঃ জীবজগতে কোটি কোটি জৈবরাসায়নিক আছে এবং রাসায়নিকরা তাদের থেকে ভিন্ন গঠনের অনু সংশ্লেষণ করে প্রকৃতির ব্যবস্থার উপরে উঠতে চায়। উপরোক্ত তৃতীয় সূত্র থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মনুষ্যসৃষ্ট যেসব জৈব যৌগ, যা প্রকৃতিতে নাই তা যদি প্রকৃতিতে ছাড়া হয়, বিশেষ করে তারা যদি জৈবভাবে সক্রিয় হয়, তবে তাদের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনাই বেশী। বিভিন্ন জাতের জৈব রাসায়নিক দ্রব্য—প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায়—তার সংখ্যা সম্ভাব্য সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, অনেক সীমিত। যতরকম প্রোটিন অণু সম্ভব জীবকোষ তার চেয়ে অনেক কম তৈরী করে। এথেকে এমন অনুমান করা যায় যে কোন জীবকোষ অতীতে কখনো ভিন্নতর এমন কোন প্রোটিন অণু বানিয়েছিল যার ফলে সেই দেহ কোষের মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকৃতি সেই এক্সপেরিমেণ্ট চিরতরে বন্ধ করে দেয়। একইভাবে প্রকৃতিতে বিজোড় কার্বন পরমাণু সংখ্যার "ফ্যাটি এ্যাসিড" পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় সবই জোড় (4, 6, 8, ইত্যাদি) সংখ্যার। এ থেকে এমন মনে করা যায় প্রকৃতি কোন কালে ওরকম সংশ্লেষণ করেছিলো এবং তাতে ক্ষতি হওয়ায় প্রকৃতি তাদের উৎপাদন চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

তাই প্রকৃতিতে নাই এমন সব মনুষ্যসৃষ্ট অণু প্রায়শঃই বিষাক্ত এবং প্রায়শঃই ক্যানসার সৃষ্টিকারী। ডি-ডি-টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। অতীতে কোন দুর্ভাগা কোষ হয়তো ঐ অণু তৈরী করে ফেলেছিলো। কুফল দেখে ফলে ঐ পরীক্ষা চিরতরে বাতিল হয়ে যায়। প্রকৃতি থেকে শিক্ষা না নিয়ে সামান্য কিছু ক্ষমতা ও জ্ঞান অর্জন করে মানুষ একটা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নতুনতর অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। ডি-ডি-টির (আবিষ্কার 1873) কীটনাশক ক্ষমতা আবিষ্কারের (1939) জন্য যে পল্ মুলারকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় (1946), সেই ডি-ডি-টি আজ বিশ্বনিন্দিত, তার উৎপাদন বহুদেশে নিষিদ্ধ। ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান লাখ কুড়ি রাসায়নিক সংশ্লেষণ করেছে, যার মধ্যে মাত্র হাজার ছয়েকের জীবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া (possible carcinogenicity) পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়েছে (1973 পর্যন্ত)। তার প্রধান কারণ, এমন পরীক্ষা ভীষণ ব্যয়বহুল, পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ।

দূষণহীন প্রযুক্তি নিয়ে সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় প্রকৃতি নীরবে অসংখ্য জাতের চমৎকার সব অণু সংশ্লেষণ করে। প্রকৃতি-যাদের সংশ্লেষণ করে তাদের আবার মৌলিক পদার্থ সমূহে ভেঙ্গে ফেলা ও জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রাবলীতে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রকৃতিই করে রাখে। জীবজগতে এইসব অণু ভাঙ্গা এনজাইমের মাধ্যমে হয়। প্রকৃতিতে অজানা মনুষ্যসৃষ্ট নতুন অণু ভাঙ্গার কোনো ব্যবস্থা প্রকৃতিতে নাই। অতএব নন্-বায়োডিগ্রেডেব্‌ল্ কৃত্রিম অজৈব অণু সংশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত মনে হয় না। তাই প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম অণু সংশ্লেষণ এবং তাদের পরিবেশে ছাড়ার শিল্পসমূহকে উন্নয়ণ বলা চলে কি? পেস্টিসাইড সমূহ, ঔষধ, রঙ, সল্‌ভেণ্টস, প্লাসটিকস, ডিটারজেণ্টস ইত্যাদির বিরূপ প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্রমে আরো বেশী বেশী করে জানা যাচ্ছে। 'মিক' যে এত মারাত্মক তা কি জানা ছিল? মিকের পরিবর্তিত রাসায়নিক অবস্থাগুলি (degradation products) আরো ভয়ংকর সম্ভবতঃ। এছাড়া মনুষ্যকৃত রাসায়নিকগুলির মধ্যে পরিবেশে এক পরস্পর-সহযোগী প্রতিক্রিয়া (synergistic interactions) সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে। যে পরিমাণে পরিবেশের এক রাসায়নিক দূষক জীবদেহে যে ক্ষতি করে, অন্য কোন দূষক বা সাধারণ অসুখের (যথা ঃ ফ্লু, চিকেন পক্স) উপস্থিতিতে তাদের ক্ষতিকর ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব থেকে প্রকৃতির প্রজ্ঞার ব্যাপারটি ঠিক মনে হয়, এবং তার মূল নিয়ম-গুলির সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষের সমাজ ও শিল্পলোকের গঠন ও বিকাশ সাধনই সঠিক নীতি মনে হয়।

রসায়নের বিপদ

এ ব্যাপারে ভূপাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভূপালের পাশে 1976সালের ইটালীর সেভেসোর ডাই অক্সিন লিক্— যার ফলে সহরের এক লাখ লোককে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়—তুচ্ছ মনে হয়। দিল্লী সায়েন্স ফোরামের হিসাবে মৃতের সংখ্যা 5,000। অন্য হিসাবে আরো বেশী—প্রায় দশ হাজার। ভারতে সাংশ্লেষনিক রসায়নশিল্প ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। রং, কৃত্রিম তন্তু, প্লাসটিক, পেস্টিসাইড্—

হরেকরকম জিনিস লাখ লাখ টনে উৎপন্ন হচ্ছে এবং পরিবেশে ঢুকছে। এদের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া এখনো অজানা। 1959-এ 106 জন লোক কেরালায় পেস্টিসাইডের বিষে মারা যায়। 1971-72 সালে ইরাকে পেস্টিসাইড দূষিত (methylmercury fungicide) গমের রুটি খেয়ে এক হাজার (অন্য মতে পাঁচ হাজার) লোক মারা গেল, ষাট হাজার লোক গুরুতর অসুস্থ হল। 1953 সাল থেকে পরিবেশে (নদীতে, সাগরে) ছাড়া পারদে দূষিত মাছ খেয়ে জাপানের মিনামাটায় 1975 সাল পর্যন্ত শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং ষাট হাজার লোক গুরুতর অসুস্থ হয়েছে, জন্ম হয়েছে প্রচুর বিকলাঙ্গ শিশুর।

লাভ্ ক্যানালে (Love Canal, Niagra Falls, New York) এক রাসায়নিক কোম্পানীর "অরগ্যানো ক্লোরিন" বর্জ্য পদার্থ স্টীলের হাজার হাজার ড্রামে ভর্তি হয়ে মাটির নিচে পোঁতা ছিল। কয়েক দশক পরে সেইসব ড্রামগুলি কালক্রমে মরচে ধরে লিক করতে থাকে এবং তলের মাটি ও ভূ-জলকে দূষিত করে দেয়। 1978-79 নাগাদ আবিষ্কার হয় যে ঐ দূষিত জলপ্রভাবেই অধিবাসীদের লিভার ও অন্যান্য অসুখবিসুখ এতদিন হচ্ছিল, মায়ের পেটের শিশুরা বাঁচছিলো না, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছিল। মার্কিন EPA 1979 সালে যে হিসাব করেছে তাতে জানা যায় যে ওদেশে আগের আগের রাসায়নিক কারখানার দরুন 1200 থেকে 2000 লাভক্যানালের মত "টাইম-বম্ব" টিক্‌টিক্ করছে। একে একে সবাই কখনো না কখনো ফাটবেই। এদের নির্দোষ করা বা সরিয়ে ফেলার খরচ প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার। কোম্পানী লাভ করে সরে পড়ল, জনসাধারণ অসুখ আর ক্ষতি পেল ; এখন সরকার জনসাধারণের টাকায় কোম্পানীর— না, বিজ্ঞানের—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এমনধারা বিজ্ঞান কি অবিজ্ঞান নয় ?

আমরা কি ভূপাল থেকে শিখবো না, শিখবো না অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ? ঐ ধরনের প্রযুক্তিকে কি ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বলা অসঙ্গত ?

প্রিয় ডক্টর ভরদারাজন.....

অনীল সদগোপাল,
এ. কে. রায়

সি. এস. আই. আর-এর ডিরেক্টর জেনারালকে লেখা খোলা চিঠি। এটি লেখা হয়েছে 'জহেরীলি গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা'র পক্ষ থেকে। স্বাক্ষর করেছেন 'টেকনিকাল সেল'-এর সদস্য অনিল সদগোপাল ও এ. কে. রায়। চিঠির তারিখ—ডিসেম্বর 15,1985

পনেরোই ডিসেম্বর, 1984 তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি কয়েকটি বক্তব্য রেখেছিলেন। ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সেরকম আর কোনো দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে যে সব বিজ্ঞানী সচেষ্ট হতে চান তাঁদের সকলের কাছ থেকেই এই বক্তব্যগুলি মনোযোগ দাবী করে।

1. আপনি বলেছেন যে কস্টিক সোডা স্ক্রাবারটি এতই কার্যকর যে এ থেকে কোনো ক্ষতিকর কিছু নির্গত হয়ে আসতে পারে না। কারবারিল (সেভিন) নামে মার্কিন পেটেন্ট নং 3,009,855 অনুযায়ী, এটির উৎপাদনে দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ফসজিনের একটি টলইন দ্রবণকে ন্যাপথক্সাইডের ক্ষারীয় দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে একটি ক্লোরোফরমেট প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে এই ক্লোরো-ফরমেটকে জল অথবা ডাইঅক্সেনের উপস্থিতিতে মিথাইল অ্যামিনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে মিথাইল আইসোসায়ানেট ('মিক') আদৌ ব্যবহৃত হয় না, এবং এটিতে ফসজিনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে কস্টিক সোডা স্ক্রাবারের কার্যকারিতাই স্বীকৃত। অথচ ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়াটিকে বদলিয়ে মিক ব্যবহার করা এবং আলাদা করে মিক মজুত করা হচ্ছিল। ফসজিনের তুলনায় মিক অনেক বেশী অস্থায়ী, বিক্রিয়াশীল এবং বিষাক্ত গ্যাস—এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি আমাদের জানাবেন, কেন ইউনিয়ন কার্বাইডকে এই মারাত্মক রাসায়নিকটি উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল ? আপনার কাছে জানতে চাইছি, কারণ আপনিই দু'ছর ধরে ডিপার্টমেন্ট অভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সেক্রেটারী ছিলেন। আর, আপনি কি এমন দাবী করেন যে কস্টিক সোডা স্ক্রাবারই এক্ষেত্রে প্রশমনের কাজে উপযুক্ত ?

2. মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানাটিকে আর কখনো চালু করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এর অর্থ আমরা ধরে নিচ্ছি, এই কারখানায় কারবারিলও আর উৎপাদন হবে না ! অথচ আপনার টীম বাকী 'মিক' প্রশমিত করতে গিয়ে কিন্তু ঠিক তাইই করছে। প্রথম কথা, আমরা আশা করছি আপনি জানেন যে কারবারিল এমন একটি কঠিন পদার্থ যা খাদ্যের মাধ্যমে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে, বা চামড়ায় শোষিত হয়ে দেহে প্রবিষ্ট হলে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। তাহলে, এই ক্ষতিকারক রাসায়নিকটিকে প্রশমিত

করার ব্যাপারে আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন? দ্বিতীয় কথা, আপনি কেন বলেছেন যে অবশিষ্ট মিককে বিনষ্ট করার **সর্বোত্তম** পন্থা হ'ল কারাবারিল উৎপন্ন করা? আপনি অন্য কি কি বিকল্পের কথা ভেবেছেন? আর বৈজ্ঞানিক বিচারে সেগুলি কম গ্রহণযোগ্যই বা কেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি সাংবাদিক সম্মেলনে কস্টিক সোডা স্ক্রাবারকে যতটা কার্যকর বলেছেন সেটি যদি সত্যিই ততটা কার্যকর হয় তবে মিককে প্রকৃত অর্থে **প্রশমিত** করার ব্যাপারে সেটিই আরো ভালো পন্থা নয় কেন? আমরা আপনাকে এ কথাও বিবেচনা করতে বলি যে নিরাপত্তার খাতিরে গ্যাসটিকে একটি চুল্লীর ভিতর ঢুকিয়ে **পুড়িয়ে ফেলাই** কাম্য। সংক্ষেপে, যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে আপনি কারবারিল উৎপাদনের মাধ্যমে মিককে 'প্রশমিত' করার পন্থাটি বেছে নিলেন সেগুলি দয়া করে আমাদের জানাবেন কি?

3. আপনি আরো বলেছেন, এক নম্বর ট্যাঙ্কে তাপমাত্রা ও চাপ বেড়ে গিয়ে মারণ গ্যাস বেরিয়ে এসেছিল যে যে ভুলের দরুণ, আপনার টীম সেগুলির আর পুনরাবৃত্তি করবে না। কার্যত এর অর্থ দাঁড়ায়, আগেকার ভুলগুলি কি কি হয়েছিল আগে আপনাকে তা জানতে হবে। আপনি কি সেগুলি জেনেছেন? এর উত্তরে আপনি বলেছেন, না। তাহ'লে ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি হবে না বুঝলেন কি করে? দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনি নিম্নলিখিত ইঙ্গিত দিয়েছেন—

ক) মিকের ট্যাঙ্কে জল ঢুকে উগ্র ধরণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকতে পারে। এর জন্য আপনি বলেছেন, যে ট্যাঙ্কটি থেকে গ্যাস নির্গত হয়েছিল তাতে অন্তত দু' টন (মিকের পরিমাণ, অর্থাৎ চল্লিশ টনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ) জল ঢুকে থাকতে হবে। ট্যাঙ্কের গ্যাস যদি উচ্চ চাপযুক্ত হয়ে থাকে তবে অতটা পরিমাণ জল ভূগর্ভস্থ সূত্র থেকে বা অন্য কোনো ভাবে ট্যাঙ্কে ঢুকল কি ভাবে? আর যদি কোনো আগম বা নির্গম নল দিয়ে জল ঢুকে থাকে তবে, অন্য যে ট্যাঙ্কটি লীক করে নি সেটিতেও ঢুকল না কেন?

খ) কোনো অজানা অশুদ্ধির উপস্থিতির দরুন মিক হয়ত কোনোভাবে কিছুটা পলিমার গঠন করে ফেলেছিল এবং এর ফলে তাপ উদ্ভূত হয়েছিল। বাইশে অক্টোবর থেকে মিক ইউনিটটি বন্ধ ছিল। তাহলে এক মাসেরও বেশী সময় পরে হঠাৎ মিক পলিমার গঠন করতে শুরু করল কি ভাবে? অন্য ট্যাঙ্কটির মিকও এই পথ অনুসরণ করল না কেন, বিশেষত যখন দুটি ট্যাঙ্কই অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে একই ভাবে সংযুক্ত ছিল?

গ) 'রাপ্চার ডিস্ক'টি যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কস্টিক সোডা স্ক্রাবার নির্গত গ্যাসকে প্রশমিত করতে পারল না কেন? দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটি যদি কোনোভাবে লীক করে তবে সেক্ষেত্রে ঐ একই স্ক্রাবার কার্যকর হবে এরকম আশা রাখা হচ্ছে কেন? স্ক্রাবারের মাথায় (আপনারই বর্ণনা মত) শুধু একটা ভিজা ক্যানভাস জুড়ে দিলেই কি ত্রুটিযুক্ত স্ক্রাবার ঠিক হয়ে যাবে?

4. আপনার একটা বক্তব্য ছিল, বিজ্ঞানীকে খোলা মন রাখতে হবে। খুবই প্রশংসনীয় মনোভাব এটা। এরই ভিত্তিতে আমরা জানতে চাইছি, মিক ছাড়া আর কি কি বিষাক্ত গ্যাস ও ক্ষতিকর রাসায়নিক আপনারা খুঁজেছেন? কি থেকে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে শুধু মিক-ই নির্গত হয়েছে? বাতাস, জল, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহের কোষ এবং গাছ-গাছড়ার উপর নির্দিষ্ট কি কি পরীক্ষা চালান হয়েছে? এই সব নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল কখন এবং কোথা থেকে? সেই তারিখগুলি আমরা জানতে পারি কি? যেমন, আপনি বলেছেন, মিক জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ডাইমিথাইল ইউরিয়া দেয়। কিন্তু মিক যখন গ্যাসীয় অবস্থায় জলের উপর ছড়িয়ে পড়ে—যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল ভূপাল লেকের উপর—তখন দ্রুত মিথাইল অ্যামিন তৈরী হয় ঠিকই কিন্তু সেই মিথাইল অ্যামিন কি পুরোটা ডাইমিথাইল ইউরিয়ায় পরিণত হতে পারে? বিশেষত যখন মিথাইল অ্যামিন জলে প্রচণ্ড মাত্রায় দ্রবণীয় এবং তার দরুন সেটার আর মিকের সংস্পর্শে না আসারই সম্ভাবনা বেশী? এটাও কি সত্যি যে মিথাইল অ্যামিন চোখ, চামড়া, শ্বসনতন্ত্র এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রচণ্ড প্রদাহ সৃষ্টি করে, আর জলের নাইট্রাইট ও নাইট্রেটগুলির সংস্পর্শে এসে এটি বিভিন্ন নাইট্রোসো-অ্যামিন তৈরী করে, যেগুলি আবার বিলম্বিত ক্রিয়ায় ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে?

5. কত সংখ্যক ব্যক্তি বাড়ীর ভিতরে থেকে বেঁচে গেছে আর কত জন পালাতে গিয়ে গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে তার কোনো রাশি-তাত্ত্বিক তথ্য আপনার হাতে আছে কি? যদি না থাকে, তবে কিসের ভিত্তিতে আপনি বললেন যে লোকেরা যদি বাড়ীর ভিতরই থাকত তবে ক্ষতি কম হত, এবং পালাতে যাওয়াটা তাদের ঠিক হয়নি। তাছাড়া আপনি সম্ভাব্য দীর্ঘকালীন প্রভাবগুলি আদৌ উল্লেখই করেন নি। ডাক্তাররা যে সব করুনিয়ার প্রদাহ দেখেছেন সেগুলি থেকে কি অন্ধতা আসতে পারে? ফুসফুসের অসুখ কতটা ব্যাপক? এ থেকে কি ধরনের সেকেণ্ডারি ইনফেকশন আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং তার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে? এটা কি সত্যি যে মিকে যারা আক্রান্ত হয়েছে ভবিষ্যতে তারা ধুলো, গন্ধ ও গ্যাসের প্রতি এমনই সংবেদী হয়ে উঠবে যে একশ কোটি ভাগের এক ভাগ বিষাক্ত পদার্থতেই তারা হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুসের অসুখে ভুগবে? এসব বিষয় কি আপনাদের পরবর্তী অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হবে? আপনার টীমের সদস্যরা কি কি নির্দিষ্ট পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাচ্ছেন? আলোচ্য বিষাক্ত পদার্থগুলি আর এ ধরনের অন্যান্য সব পদার্থের মোকাবিলা করার ব্যাপারে সেগুলি আমাদেরকে নতুন কি তত্ত্ব দেবে?

এই সব প্রশ্ন আমরা আলাদা করে খোলা চিঠিতে আপনার কাছে রাখছি, কারণ সাংবাদিক সম্মেলনে এসব প্রশ্ন পেশ করার সময় বা অনুমতি কোনটিই ছিল না। সম্মেলনের শুরুতে মধ্যপ্রদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্রী এন. আর কৃষ্ণন আপনার প্রচুর সংখ্যক যোগ্যতাবলী, বিশেষ সম্মান ও পদবীর তালিকা এবং উচ্চ পদ অলংকৃত করার যে ফিরিস্তি পাঠ করেছেন সেগুলির কথা ভেবেই আমার মনে করছি যে এসব প্রশ্নের উত্তর আপনিই সবচেয়ে ভাল দিতে পারবেন। উত্তর দিতে পারবেন শুধু বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের কাছেই নয়, ভূপালের সেইসব দুলক্ষাধিক মানুষের কাছেও যাঁরা গ্যাসের প্রত্যক্ষ আক্রমণ সয়েছেন, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং প্রশংসনীয়ভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন - অথচ আপনার বিভিন্ন বক্তব্যে যাঁদের কোনই উল্লেখ নেই।

গ্রন্থাগার—গণশিক্ষার একটি মাধ্যম।

গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম দীর্ঘকাল অনাদৃত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষানীতি এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থার আওতায় গ্রন্থাগারের কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬। এছাড়া ১৯৭৯ সালের গ্রন্থাগার আইন এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আরো সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কার্যনির্বাহ এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত জনমত গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যাবহারের সুবিধাকে এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর নজীর আর নেই।

৯-১৪ বছর বয়েসের যেসব ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক কারণে বা জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য খোলা হয়েছে ১৬, ৬৬০ টি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র। গত ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১.৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্জন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

৪৪৬-তথ্য/এ

ভূপালের ডায়েরী—চিকিৎসাচিত্র

ডাঃ সুজিত কুমার দাশ

ভূপালের দুর্ঘটনার পর সুষ্ঠু চিকিৎসা-ব্যবস্থা, এবং জনজীবন ও পরিবেশের দীর্ঘকালীন ক্ষতি প্রতিরোধের সঠিক প্রয়াস সবচেয়ে জরুরী। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, গোপনীয়তার নীতি—এক চিকিৎসকের প্রতিবেদন। পশ্চিমবাংলা থেকে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের যে টীম ভূপাল গিয়েছিল জহেরিলী গ্যাস কাণ্ড মোর্চার আহ্বানে, ডাঃ দাশ ছিলেন তার সদস্য।

"আজকের কাগজের খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। গ্যাসের বিষক্রিয়ায় অন্ধ হয়েছেন এমন কোন মানুষ ভূপালে নেই।" একটু উত্তেজিতভাবেই কথাটা বললেন তরুণ ডাঃ পাণ্ডে। ডাঃ পাণ্ডে মাত্র দেড় বছর হলো ডাক্তারি পাশ করেছেন ভূপালের গান্ধী মেডিকাল কলেজ থেকে। একটা ছোট্ট পাহাড়ী টিলার ওপর মেডিকাল কলেজের অট্টালিকা। তারই একপ্রান্তে স্কুটারের উপর বসে ডাঃ পাণ্ডে বললেন, "কাগজের সব কথা বিশ্বাস করবেন না। বোম্বাই-এর কোন এক প্রতিষ্ঠানের সোশাল সায়েন্সের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর দল কয়েকটা বস্তি ঘুরে কাগজে এক বিবৃতি দিয়েছে যে কয়েক হাজার লোক গ্যাসের বিষক্রিয়ায় অন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আমরা গত আড়াই মাস ধরে হামিদিয়া হাসপাতালে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছি, সবকটা বস্তিতে ঘুরেছি—একটি অন্ধ লোকেরও দেখা পাইনি। আসলে ঐসব ছাত্রের দল 'অন্ধ' কথাটার অর্থই বোঝেনা। হয়তো বলেছে—'চোখে দেখতে পাচ্ছি না'—ব্যস, অমনি ধরে নিয়েছে যে লোকটি বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বহু লোকেরই হয়েছে কিন্তু সকলেই দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে এবং পাচ্ছে। মিক (Methyl Isocyanate)-এর বিষক্রিয়ায় চোখের কষ্ট হয় বটে কিন্তু কেউ অন্ধ হয়না।"

"মিক-এর বিষক্রিয়ায় কি কি ক্ষতি হয় বলতে পারেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ডাঃ পাণ্ডেকে, "শুনেছি—ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়, ক্যান্সার হয়; কিডনী নষ্ট হয়ে যায়, সায়ানাইড পয়জনিং হয়—এসব কি সত্যি? আপনারা কি ধরনের ক্ষতি দেখেছেন?"

ডাঃ পাণ্ডের উত্তেজনা ও উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। বললেন, "সে অনেক কথা—বলতে অনেক সময় লাগবে। এখন বলা যাবে না।" আমার সময় ছিল। তাই ডাঃ পাণ্ডে ও তার আরো তিন জন সহকর্মী ডাক্তারকে নিয়ে পাশের কফিশপ-এ দুঘণ্টা কাটিয়েছিলাম সেই 'অনেক কথা' জানবার উদ্দেশ্যে।

আসলে কিন্তু 'মিক' ও 'ফস্‌জিন' গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য ডাক্তাররা বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। কারণ এ সম্বন্ধে তথ্য বিজ্ঞানীমহলে বিরল। 'মিক'-এর জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও প্রবণতা সমীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব আশংকা করেছেন এবং ভূপালের মানুষের মৃত্যু ও রোগের প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

অ্যাসিটিলকোলিন (Acetylcholine বা AC) মানবদেহে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। স্নায়ু ও পেশীর কাজকর্ম চালিত করে বলে দেহের শ্বাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি যন্ত্রের পেশীর কাজে AC-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পেশী সংকোচনের প্রয়োজনে AC তৈরী হয় এবং অ্যাসিটিলকোলিন এস্টেরেজ (Acetylcholine esterase বা ACE) নামক এনজাইম AC কে ভেঙ্গে নষ্ট করে দেয়; ফলে সংকুচিত পেশী পুনরায় আবার প্রসারিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 'মিক' ACE-কে অকর্মণ্য করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে; ফলে দেহে AC অত্যধিক পরিমাণে জমে যায়; যার জন্য চোখ দিয়ে অত্যধিক জল পড়া, যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে জল জমা, ঘন ঘন দাস্ত বা প্রস্রাব ইত্যাদি হতে পারে। দেহের কিছু রাসায়নিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে মিক দেহে সায়ানাইড তৈরী করতে পারে এবং ফলে সায়ানাইড বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যেতে পারে। সেই সঙ্গে রক্তকণিকা ও লিভারের ক্ষতি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

ভূপালে যে ধরনের ক্ষতি দেখা গেছে তা মোটামুটি এই রকম ঃ-

(1) চোখ ঃ জ্বালাপোড়া, জলপড়া, আলোয় অন্ধ, দৃষ্টি-হীনতা ইত্যাদি। 2/3 দিনে প্রায় 60 হাজার লোক চোখের কষ্ট নিয়ে হাসপাতালে আসেন। ধীরে ধীরে সকলেই সেরে উঠছেন এবং স্থায়ী ক্ষতি এখনো কারো হয়নি। তবে কারো কারো কর্নিয়ার ক্ষতির জন্য অন্ধ হবার আশংকা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নতুন কর্নিয়া সংস্থাপন করে দৃষ্টিদান সম্ভব।

(2) ফুসফুস ঃ শ্বাসকষ্ট, দম বন্ধ হওয়া, বুকের যন্ত্রণা ইত্যাদি। চিকিৎসার ফলে প্রায় সকলেই সাময়িক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেও পরে আবার বুকের কষ্ট নিয়ে অনেকেই হাসপাতালে আসছেন। পরীক্ষার ফলে বহু লোকের ফুসফুসের স্থায়ী ক্ষতি ধরা পড়েছে। ফুসফুসের জখমেই অধিকাংশ মৃত্যু হয়েছে।

(3) লিভার ঃ বেশ কিছু লোকের জন্ডিস ধরা পড়েছে। পরে আরো লোক আক্রান্ত হতে পারেন।

(4) রক্ত ঃ রক্তকণিকার ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

গ্যাসে আক্রান্ত লোকেদের চিকিৎসা সাধ্যানুযায়ী সকলেই করেছেন। সরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি চিকিৎসকরা দিনরাত চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন। মেডিক্যাল কলেজের প্রায় প্রতিটি ছাত্র হাসপাতালে কাজ করেছেন। এখনো চিকিৎসকদের দল নিয়মিত ভাবে আক্রান্ত বস্তিগুলিতে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব কিছু গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সরকার ও ইউনিয়ন কার্বাইডের প্রয়াস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সমগ্র ভূপাল এক গোপনীয়তার বেড়াজালে বন্দী। বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে চিকিৎসার ব্যাপারে ভূপালের চিকিৎসকরা কোন রকম সাহায্য কোথা থেকে পাননি। তারা অন্ধের মত হাতড়ে বেরিয়েছেন এবং নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেছেন। মিক-এর বিষক্রিয়ার কোন তথ্য পাননি, চিকিৎসা-পদ্ধতির কোন নির্দেশিকা পাননি, গ্যাসের মধ্যে 'মিক' ছাড়া অন্য কিছু ছিল কি না তা জানতে পারেননি, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সূত্র বা তার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল না। এর উপর ছিল কড়া সরকারী নির্দেশ – রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে কোন তথ্য বাইরে প্রকাশ করা চলবেনা এবং কারো সঙ্গে পরামর্শ করা চলবেনা। বেসরকারি চিকিৎসকরাও এই নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং মেনেছিলেন, যদিও নির্দেশ মানার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল না।

এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও অনেক খবর চেপে রাখা যায়নি। ফুসফুসের স্থায়ী ক্ষতি অনেকের ধরা পড়েছে—বেশ কিছু লোক ভূপালের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অভ মেডিকাল রিসার্চ (ICMR)-এর সমীক্ষায় সায়ানাইড বিষক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং Sodium Thiosulphate দিয়ে চিকিৎসার ফলে কার্যকারী সুফল মিলেছে। চিকিৎসায় সেরে ওঠার পথে কয়েকটি মৃত্যু হয়েছে হার্টফেল করে। কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভপাত ও মৃত শিশুর জন্ম হয়েছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী গোপনীয়তার নীতিটাই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড—কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান শ্রী ঈশ্বর দাস প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন যে ইউনিয়ন কারবাইডের কাছে 'মিক' বিষক্রিয়া ও তার চিকিৎসার অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সরকারকে ঐসব তথ্য জানাচ্ছেন না। অথচ সরকার নিজেই গোপনীয়তার নীতি আঁকড়ে ধরে আছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যে চিকিৎসকদের দল পাঠিয়েছিলেন তারা এই গোপনীয়তার বাধা অতিক্রম করেও অনেক তথ্য জোগাড় ও প্রকাশ করেছেন এবং চিকিৎসার বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছেন। সুপারিশগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :—

1. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে ময়না তদন্তের রিপোর্ট সহ সবকিছু তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং প্রতিটি রোগীকে তার নিজের দেহের মেডিকাল রেকর্ড দিতে হবে।

2. গ্যাসে আক্রান্ত সকলের জন্য সায়ানাইড বিষক্রিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে।

3. যেসব গর্ভবতী নারী প্রথম তিন মাসের মধ্যে গ্যাসের কবলে পড়েছেন তাদের জানাতে হবে যে তাদের সন্তান পঙ্গু হয়ে জন্মাতে পারে এবং তারা যদি ভ্রূণনাশের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে ভ্রূণনাশের আধুনিক ব্যবস্থা এখুনি তাদের জন্য করতে হবে।

4. প্রজননযোগ্য স্বামী-স্ত্রীকে (couples of reproductive age) জানাতে হবে তাদের দেহের বিষক্রিয়া নষ্ট করার পূর্বে তারা যেন গর্ভ-সঞ্চার থেকে বিরত থাকেন।

5. গ্যাসাক্রান্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য বিশেষ দল গঠন করে তাদের বাসস্থানে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে হবে।

6. রোগীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে তাদের সজ্ঞান সম্মতি (informed consent) আবশ্যিক করতে হবে।

7. নিম্নলিখিত বিষয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ সমীক্ষার প্রয়োজন—

(ক) দেহের প্রতিরোধ প্রক্রিয়া (immune system)
(খ) রক্ত, লিভার, কিডনী
(গ) স্নায়ু ও মস্তিষ্ক
(ঘ) মিউটাজেনিক ও টেরাটোজেনিক প্রভাব
(ঙ) কারসিনোজেনিক প্রভাব।

8. গ্যাসাক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের সন্তান–সন্ততিদের ভবিষ্যৎ রোগ ও মৃত্যুর হার ও প্রকৃতি লক্ষ্য করার জন্য দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা নিতে হবে।

9. গ্যাস পরিবেশের কতটা ক্ষতি করেছে—তা পরিমাপ করে তার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে হবে।

এইসব সুপারিশ অনুসরণ ও রূপায়ণ করা সম্ভব। অর্থাৎ এর জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী এদেশে আছে। কিন্তু সকলেই আশংকা করছেন যে এসব কিছুই করা হবে না। আবার যদি কোথাও ভূপালের মত ঘটনা ঘটে, সেখানকার লোকজনের পরিণতি বোধহয় একই হবে।

ভূপাল সম্ভাবনা —দেশে দেশে

নিউইয়র্কের মিড্‌লপোর্টের অদূরে বাফেলোর উত্তরপূর্বে রয়েছে ছোট্ট জনবসতি। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলাহলে মুখরিত থাকে সারাদিন। পাশেই এফ. এম. সি. কর্পোরেশনের কীটনাশক কারখানা। ফারাক 400 গজের বেশী হবে না। গত মাসেই একদিন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বেশ খানিক মিথাইল আইসোসায়ানেট (MIC)। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা ছুটে আসে। চটপট ছেলেমেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যায়। তবে বিষের ছোবল থেকে নিস্তার পেয়েছে সকলে—এমন নয়।

মিড্‌লপোর্ট থেকে আনুমানিক সাত হাজার মাইল দূরে অবস্থিত জাপানের টোকিও শহর। সেখানকার আর একটি স্কুলের কথা বলি। সেখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়মিত একটি ড্রিল করতে হয়। বিপদ-সংকেত শুনে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া। না, আবার একটি পরমাণু বোমার ভয়ে নয়। গোটা শহরময় যে অজস্র গ্যাস পাইপলাইন রয়েছে সেগুলি যে কোন দিন একটি ভূমিকম্পে ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে—সেই ভয়ে।

আর একটি নতুন শহর টাইমসবীচের—'মো'। সেখানে অবশ্য এখন আর ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। কারণ ইতিমধ্যেই তা জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে যে সেখানকার জল মাটি ডায়োক্সিন বিষে ভরা।

ওপরের তিনটি আলাদা আলাদা ঘটনা। শিক্ষা একটাই—শিল্পায়নের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক বিপদ। দু'ধরনের বিপদের আশংকা। এক, সরাসরি। আর কতগুলি সরাসরি নয়,—কিছুটা ঘুরিয়ে। সরাসরি দুর্ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম ঘটে। যেমন ঘটেছে ভূপালে।

তবে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে ঘোরানো বিপদগুলিই। সেগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটে। ধীরে নিঃশব্দে। কেউ টেরও পান না কেমন ভাবে জল মাটি বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে। তারপর একসময় যখন আবিষ্কৃত হয় তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বহু বিপজ্জনক পদার্থ কারখানার আবর্জনা হিসেবে অবলীলায় স্তূপীকৃত হচ্ছে মাটির তলায় অথবা সমুদ্রের নীচে। এর মধ্যে রয়েছে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল্‌স, ক্লোরোফর্ম, ডায়োক্সিন, তেজস্ক্রিয় বস্তু, ইত্যাদি। অথচ এগুলির দীর্ঘকালীন প্রভাব সম্পর্কে অল্পই জানে মানুষ। ফলে কোন কোন এলাকায় হঠাৎ ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাও বিকৃত শিশু জন্মের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে ছেষট্টি হাজারের বেশী রাসায়নিক পদার্থ শিল্প-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ মানুষ বা প্রকৃতির উপর এর দুই-তৃতীয়াংশের বেশী পদার্থের প্রভাব সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

দুর্ঘটনা যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। প্রসঙ্গত মেক্সিকো শহরের কথা উল্লেখ কয়া যায়। গত 19শে নভেম্বরের ঘটনা। সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় শিল্প-দুর্ঘটনা সেখানকার। শহরের প্রান্তে অবস্থিত সান জুয়ান ইক্সহাউট্‌পেক। সেদিন পর পর গোটা কয়েক গ্যাস-ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হল। মারা গেছে সাড়ে চারশোর ওপর মানুষ। এই দুর্ঘটনার পর থেকে শহরের শিল্পাঞ্চল এলাকার মানুষজন এমন দু' একটি কারখানা অচিরেই স্থানান্তরিত করার জন্য দাবী জানাতে শুরু করেছেন। হিসেব কষে দেখা গেছে এমন একটি কারখানা অপসারণে ব্যয় হবে 300 মিলিয়ন ডলারের মত। সরকারী তরফে জানান হয়েছে—"ঝুঁকি থাকলেই তাকে বিপজ্জনক মনে করা ঠিক নয়।"

গত অক্টোবর মাসের ঘটনা। উত্তর আমেরিকায় নিউজার্সির আমেরিকান সায়নামাইড কারখানা থেকে ম্যালাথিয়ন লিক করে ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। শ'দেড়েক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পশ্চিম ইউরোপ এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত নয়। ইটালীর মিলানের কাছে সেভেসো রাসায়নিক কারখানার কথা মনে আছে সকলেরই। তারিখটা ছিল 1976 সালের 10ই জুলাই। দুই থেকে বাইশ পাউণ্ডের মধ্যে কোন পরিমাণ ডায়োক্সিন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষকে শহর থেকে স্থানান্তরিত করতে হয়। বহু শিশু আক্রান্ত হয় বিষে। পরবর্তীকালে এক ধরনের চামড়ার অসুখ দেখা দিয়েছে তাদের। প্রায় এক কোটি ঘনফুট দূষিত মাটি চাপা দিতে হয়েছে প্লাস্টিক শীট, কাদা ও কংক্রীটের নীচে। বিপদ আপাততঃ চাপা দেওয়া গেছে বলে মনে করা হলেও আগামী দিনে যে ক্যান্সার বা অনুরূপ অসুখের আকারে তা দেখা দেবে না তার গ্যারাণ্টী কোথায়?

ইউরোপের বহু দেশ মিক প্রস্তুত করে বা আমদানী করে। বৃটেনের সিবা-গাইগীই একমাত্র কোম্পানী যার এই নিয়ে কাজ-কারবারের অনুমতি রয়েছে। 'গ্রিম্‌স-বে'র মাইল দুয়েক দূরে

এদের 'মিক'-গুদাম। শহরের লোকসংখ্যা 92 হাজারের মত। লোকজন এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছেন। সেখানকার একজন আন্দোলনকারীর ভয়—হঠাৎ যদি কোন উন্মাদ ট্যাঙ্কের একটি ভাল্‌ভ খুলে দেয় তো আমরা সব একসাথে সাবাড় হব।

ইউরোপে মিকের সবচেয়ে বড় মজুতদার ফ্রান্স। যদিও তাদের নিজেদের দেশে মিক উৎপাদনের অনুমতি নেই। সেখানে 20 টনের মত মিক মজুত রাখে ইউনিয়ন কার্বাইডেরই এক সহযোগী সংস্থা। সেগুলি আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় একশ কোটি টনের মত আগাছা-নাশক নিজেরা উৎপাদন করেছে এবং 79 মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমাণ বাইরের দেশ থেকে আমদানী করেছে। মার্কিন মুলুকের বড় বড় কীটনাশক উৎপাদকদের মধ্যে রয়েছে ডাও কেমিক্যাল, আমেরিকান সায়নামাইড, ইউনিয়ন কার্বাইড।

গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছে 219 টির মত তৈল শোধনাগার এবং প্রায় 2,50,000 মাইলের মত তেলের পাইপ-লাইন আর 13 লক্ষ মাইলের মত গ্যাস পাইপলাইন। এগুলি জালের মত ছড়িয়ে আছে গোটা দেশে। এছাড়া আছে বিশাল বিশাল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। লিনডেনে ও কার্টারেটে রয়েছে দশতলা সমান এক একটি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে —হঠাৎ যদি একটি উড়োজাহাজ ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটবে তা একটি শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

দুর্ঘটনা সর্বত্রই হতে পারে। তবে অনুন্নত দেশগুলিতে এর সম্ভাবনা বেশী। বহুজাতিক কোম্পানীগুলির অতি-মুনাফার লোভ এজন্য দায়ী। সস্তা শ্রম এবং আইন-কানুনের শিথিলতার সুযোগে যথেচ্ছাচার করে থাকে এরা। অবশ্যি ভিন্নমতও পোষণ করেন অনেকে। তাদের মতে কারিগরী দিক থেকে উন্নত দেশের সাথে এদেশের প্ল্যাণ্টগুলির পার্থক্য থাকে সামান্যই। আসলে এগুলি স্থাপন করলেও করা দরকার জনবিরল এলাকায়। এই সব দেশে কারখানা তেমন এলাকায় স্থাপন করলেও অচিরেই তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে জনবসতি। আর পথঘাট যানবাহনের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষজনকে দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরণের কাজ সম্ভব হয় না। লোক মরে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা সমস্যার ব্যাপকতা নিয়ে চিন্তিত। তাদের মতে বিভিন্ন শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রায় এসে পৌছেছে। মার্কিন দেশে এর পরিমাণ বছরে 9 হাজার কোটি পাউণ্ডের মত। এর মধ্যে আর্সেনিক, মার্কারী, ট্রাইক্লোরোফেনলের মত বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অবধি রয়েছে। কিন্তু এর 10 শতাংশের বেশী আবর্জনা যথোপযুক্ত সাবধানতা সহ জমা করা হয় না। মার্কিন দেশে হাজার পঞ্চাশেক ডাম্পিং গ্রাউণ্ড রয়েছে। এর মধ্যে 14 হাজারটি অঞ্চল বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অনেক এলাকায় ভূগর্ভ জলে মিশে যাচ্ছে এই বিষ।

যেমন তেমন করে শিল্প আবর্জনা মজুত করার বিপদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নায়গারা ফল্‌স এলাকার লাভ-ক্যানাল। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে হুকার কেমিক্যাল কোম্পানী লক্ষ লক্ষ ব্যারেল আবর্জনা এখানে ফেলেছে। পরে 1953তে মাটি ভর্তি করে জনবসতি স্থাপনের জন্য বিক্রি-বণ্টন হয় এই এলাকা। ক্রমে বাড়ী ঘর দুয়ার তথা জনবসতি গড়ে ওঠে। সত্তর দশক থেকে ওখানকার বেসমেণ্টের ঘরগুলোতে কালো বর্ণের এক ধরনের তরল পদার্থ চুঁইয়ে বেরোতে থাকে। আর এপার্টমেণ্টের লোকেদের মধ্যে দেখা দেয় নানা ধরনের অসুস্থতা। যেমন,—হাঁফানী, হেপাটাইটিস, কিডনীর অসুখ, বিকৃত শিশুর জন্ম ইত্যাদি। '78 সাল থেকে লোকজন ক্রমে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এখন ওই দেশে "লাভ ক্যানাল"-এর পরিচয় "বিষের শহর" বলে।

এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। ম্যাসাচুসেটস্‌-এর উবার্ন এলাকায় লিউকোমিয়া রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। এলাকাটি দুটি আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত। হাই-টেক্‌ শিল্পের স্বর্গভূমি ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালীও এখন আবর্জনার কুফলে আক্রান্ত। বছর দুই আগে সমস্যাটি ধরা পড়ে। লস পাসোস এলাকায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হার বৃদ্ধি পায়। ধরা পড়ে ফেয়ারচাইল্ডের একটি কারখানার তরল আবর্জনা দিয়ে পানীয় জল দূষণ হচ্ছে। একজন পরিবেশ-আন্দোলনের কর্মীর মতে— পানীয় জল এভাবে দূষিত হতে থাকলে একদিন গোটা এলাকাটাই মরুভূমিতে পরিণত হবে।

গোটা পৃথিবীর হিসেব নিলে দেখা যাবে এ ধরনের আবর্জনার পরিমাণ কিভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ চরমে উঠছে। গত সেপ্টেম্বরে স্কটল্যাণ্ডের কেস ইণ্টারন্যাশানাল তাদের আবর্জনা রিপ্রসেসিং এর প্লাণ্ট আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে বন্ধ করে দিয়েছে। ওই এলাকার বহু শিশু জন্ম নিচ্ছিল চোখের দোষ নিয়ে, এমন কি চক্ষুহীন অবস্থায়। ক্যান্সার রোগের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সরকারী পরীক্ষাগারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ওই প্লাণ্টের মধ্যে পলিক্লোরিনেটেড বাই মিথাইল (PCB) পোড়ানো ফলে ডায়োক্সিন গ্যাস ছড়াচ্ছিল।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনার বিপদ নিয়ে হৈ চৈ বেশী হচ্ছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার বিপদ এখনও রাসায়নিকের তুলনায় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। তবু রাসায়নিকের বিষয়ে উদাসীনতা কাটেনি এখনও।

তবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। Environmental Protection Agency (EPA)'র হিসেব মতে এই সমস্ত বিপজ্জনক এলাকা পরিষ্কার করতে লাগবে প্রচুর সময় এবং বহু হাজার কোটি টাকা। কে করবে সে কাজ ?

এক বিশেষজ্ঞ অবশ্যি পরামর্শ দিয়েছেন—টেকনোলজির স্বার্থে এই ঝুঁকিটুকু তো মেনে নিতেই হবে! ভদ্দরলোকটির নাম মাইকেল ব্রাউন। এমন অনেক মাইকেল ব্রাউন রয়েছেন আশে-পাশে। এরা সকলেই বিশেষজ্ঞ। এই সব বিশেষজ্ঞের মাঝে আমাদের কথা বলার অধিকার কোথায় ? □

—নিউ ইয়র্কের "টাইম" পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

ভূপাল দুর্ঘটনা কলকাতার কার্বাইড ও মাল্‌টিন্যাশানাল মেজাজ

ভূপালে ইউনিয়ন কারবাইড কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটেছে গত 3রা ডিসেম্বর। 14ই ডিসেম্বর এই নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক সংস্থা এবং শিক্ষক-ছাত্র এই মিছিলে যোগ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থাও সেখানে ছিল। কলকাতায় মিডলটন স্ট্রীটের ইউনিয়ন কার্বাইডের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান হল। বিজ্ঞানকর্মীদের এক প্রতিনিধিদল কার্বাইড কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে প্রতিবাদলিপি দেয় এবং কয়েকটি দাবী জানায়। কার্বাইডের তরফে আলোচনায় যোগ দেয় তাদের পার্সোনেল ম্যানেজার। ম্যানেজারটির আচরণে কোন উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যায় না। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমাদের সাথে কথা বলতে হল। গুটিকয়েক কথার শেষেই বলবেন— 'এবার আসুন' এমন একটি ভঙ্গি।

মিছিল শুরু হয় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে। সামনে কালো ব্যানার বড় বড় সাদা অক্ষরে—'পৃথিবীর আর কোন দেশে আর কোন ভূপাল নয়'। সবার বুকে আঁটা কালো ব্যাজ। তাতে লেখা—'ধ্বংস উপত্যকা ভূপাল / সমবেদনা ঘৃণা আর উদ্বেগে এই পথ চলা'। কোন অজানা কারণে মিছিলের সামনে ও পেছনে বিশদ পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল— 'এটাই রীতি'। খারাপ লাগছিল। বিশেষ করে মিছিলের মেজাজের সাথে বড়ই বিসদৃশ ঠেকছিল এই ব্যবস্থা। বুঝলাম, অনুভূতিহীন রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখে সব মিছিলের ভাষাই এক। বেলা দুটো নাগাদ মিছিল কার্বাইড অফিসের সামনে হাজির হল। কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে দেওয়া হল না। এগিয়ে এল পুলিশ। বন্দোবস্ত তারাই করবেন। প্রতিনিধি দলের নাম ও পরিচয় জানতে চাইলেন। আবার খট্‌কা লাগল। সাধারণ একজন নাগরিক পরিচয়টি যথেষ্ট নয় তাদের কাছে। আমাদের নাম ক'টা দিলাম— এবং অবশ্যই পেশাগত পরিচয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্লায়েড ফিজিক্স-এর অধ্যাপক এবং শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মানস কুমার জোয়ারদার, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক বুদ্ধদেব বাগচী, কলকাতার বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক অভিজিৎ লাহিড়ী, কলকাতার একটি প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসক দেবাশিস দত্ত এবং প্রতিবেদক নিজে—বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক পরিচয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভেতর থেকে ডাক এলো। পুলিশের লোক আমাদের নিতে এলো। কেতা-কানুন দেখে মনে হচ্ছিল কার্বাইডের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করতে চলেছি। তেমন ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলাম আমরা। গিয়ে হতাশ হতে হল। পুলিশের লোকেরা আমাদের কার্বাইড অফিসের ফ্লোরে রিসেপশন কাউণ্টারের সামনে নিয়ে হাজির করলেন। মাঝারি স্তরের একজন অফিসার এলেন কথা বলতে। সামনে কাউণ্টার। মুখোমুখি একটি সোফা। জনা তিনেক লোক বসতে পারে। বাঁ পাশের দরজা দিয়ে লম্বা দোহারা গড়নের একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের বসতে বললেন। যথাসম্ভব ঘেঁষাঘেষি ও আগু-পেছু হয়ে বসলাম ছ' জন সেই সোফায়। বুঝলাম ইনিই আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। বসতে অনুরোধ করলাম ওনাকেও। তিনি কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলেন। কথা শুরু করে দিলেন—"বলুন আপনাদের কি বলার আছে?"

আমরা জানালাম—"না, আমরা বলতে নয়, শুনতে এসেছি। তার আগে আপনি একটা বসার কিছু আনিয়ে বসুন। তা না হ'লে এভাবে কথা বলতে অস্বস্তি লাগছে আমাদের।"

উত্তর—"আমি দাঁড়িয়েই বলছি, বলুন।"

আবারো সবাই মিলে অনুরোধ করলাম ওনাকে বসতে। রাজি হলেন না। বুঝলাম উনি কথা বলায় আগ্রহী নন। ইতিমধ্যে অফিসের আরও কিছু কর্মীও হাজির হয়েছেন আশপাশে দেখলাম। আমরা অবশ্যি দীর্ঘ আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েও যাইনি। আমাদের বক্তব্য এবং স্বাক্ষরলিপিটি হাতে দেব এবং দু'চারটি তথ্য জেনে নিয়ে চলে আসব, এই ঠিক ছিল। আশা ছিল ওনারাও এই ঘটনায় মর্মাহত। বিশেষ করে ঘটনাটি যখন ওনাদেরই একটি কারখানায় ঘটেছে। ফলে সমবেদনা জানিয়ে ওনারাও দুচার কথা বলবেন, এমনটিই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু হতাশ হতে হল। উল্টে ওনার ভাবভঙ্গীতে বেশ উদ্ধত ব্যবহার লক্ষ্য করলাম। যেন আমরা ওদের কর্মচারী প্রতিনিধি, কিছু দাবী দাওয়া নিয়ে গেছি। ভীষণ বিরক্ত বোধ করছেন কথা বলতে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার পরিচয়?"

উত্তর : পার্সোনেল ম্যানেজার আমি এখানকার।

আবারও হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম একজন টেকনিক্যাল লোক অন্তত আমাদের সাথে কথা বলতে উপস্থিত থাকবেন। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম।

এরপর আমাদের তরফে জানালাম—"দেখুন, আমরা শিক্ষক-ছাত্র-সাংস্কৃতিক কর্মী-সাংবাদিক সবাই নিলে মিছিল করে আপনাদের কাছে এসেছি। এই ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে।"

উঃ—অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যতক্ষণ না রিপোর্ট বেরোয় ততক্ষণ আমাদের কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন ঃ—দেখুন, এত বিরাট একটা ঘটনা ঘটল। এত লোক মারা গেল। বুঝতেই পারছেন—ঠিক কি ঘটেছিল জানবার জন্য সাধারণ মানুষ খুবই উদ্‌গ্রীব।

উঃ—দুঃখিত, আমাদের কিছু বলার নেই।

প্রঃ—কিন্তু প্রাথমিক তথ্যটি মানুষকে জানানো আপনাদের কর্তব্য নয় কি?

উঃ—বললাম তো—কিছু বলা সম্ভব নয়। কাগজ-পত্রেই তো দেখছেন খবর।

প্রঃ—তা ঠিক। কিন্তু আপনিও তো স্বীকার করবেন, খবরের কাগজে যে সমস্ত খবর বেরোচ্ছে তার অনেকটাই পরস্পরবিরোধী। সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি নির্ভরযোগ্য তথ্য কিছু জানতে।

উঃ—না। এর বেশী আমার কিছুই বলার নেই।

প্রঃ—কিন্তু, আপনি তো কিছুই বললেন না।

এদিকে বাইরে তখন শ' দুয়েক লোকের বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। ঘন ঘন শ্লোগান চলছে। একের পর এক বক্তা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন। আমরা দেখে এসেছি আশপাশের অফিসের বহু লোক জড়ো হয়েছে নীচে।

প্রঃ—আপনার উপর কি ওপরওলার নির্দেশ আছে এর বেশী কিছু না বলার?

উঃ—না।

দেখলাম ভদ্রলোকের মুখে বিশেষ কথা জোগাচ্ছে না। বেশ একটু নার্ভাস মনে হচ্ছিল এতক্ষণে। এবার নিজে থেকেই একটি ভালো অজুহাত পেয়েছেন মনে করে বললেন—

"—আমি তো টেকনিক্যাল লোক নই। এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

প্রঃ—আমরাও তো সে কথাই বলছিলাম। সেজন্যই তো একজন competent লোকের সাথে কথা বলতে চাইছিলাম আমরা। টেকনিক্যাল ক্যাডারের কোন অফিসার নেই অফিসে?

উঃ—না। তাদের কেউ অফিসে নেই এখন।

প্রঃ—একজনও নেই? ছুটিতে গেছেন নাকি সবাই?

উঃ—না। তারা সবাই ভূপালের ব্যাপারে ব্যস্ত।

প্রঃ—তার মানে সবাই ভূপাল গেছে?

উঃ—না, বোম্বাই।

বুঝলাম ভদ্রলোক এবার একটু প্যাঁচে পড়ে গেছেন। ঠিক কথা বলছেন না। একটু চেপে ধরলে এলোমেলো বলবেন। আবারো অনুরোধ করলাম একটা চেয়ার এনে বসতে। বসলেন না। বুঝতে পারছি গোঁ চেপে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও আর বসবেন না।

প্রঃ—শুনেছি এটা আপনাদের হেড অফিস। ভূপালের কাজকর্ম এখান থেকেই হয় তাহলে?

উঃ—ভূপালের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।

এরপর নিজের পয়েন্টটা জোরদার করতে আর একটু যোগ করলেন—"আর এখানে যারা আছেন তারা ভূপালের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। ভূপালের expert সব বোম্বাই অফিসে বসেন।"

প্রঃ—এখানে আপনাদের কি হয়?

উঃ—এখানে ব্যাটারী।

প্রঃ—তাহলে ব্যাটারীর expert সব বোম্বাই গেলেন কেন?

উঃ—বললাম তো ভূপালের ব্যাপারে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া উচিত মনে হল। কারণ ভদ্রলোক খুবই অস্বস্তিতে পড়েছেন বুঝলাম। এবং প্রতিমুহূর্তেই আলোচনা শেষ করার ইঙ্গিত করছেন। আমরা বললাম—"আচ্ছা, আপনাদের এখানে ব্যাটারী কারখানায় কি কি কেমিক্যালস্ নিয়ে কাজকর্ম হয় একটু আন্দাজ দেবেন কি?

এতক্ষণে একটা মুখের মত জবাব পেয়েছেন মনে করে বললেন—

"আপনারা তো সায়েন্সের লোক। নিশ্চয়ই জানেন ব্যাটারী তৈরীতে কি কি লাগে।"

প্রঃ—ঠিকই বলেছেন। জানি আমরা। আর এও জানি ওই কারখানায় বেশ কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহার হয়। যা সেখানকার কর্মী ও আশপাশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। তা, এই কাজকর্মগুলি কিভাবে হয় সেটা যদি আমরা দেখতে চাই অনুমতি দেবেন কি?

উঃ—না। বাইরের লোককে আমরা কারখানায় ঢুকতে দিই না।

প্রঃ—কেন?

উঃ—আমাদের Technical secrecy-র ব্যাপার আছে।

প্রঃ—কেন—আপনিই তো বললেন ব্যাটারীর ব্যাপারটা সবাই জানে। তাহলে আর secrecy-র কি আছে।

উঃ—এ ব্যাপারটা দেখার জন্য গভর্নমেন্টের দপ্তর আছে। তারাই ইনস্পেক্ট করেন আমাদের কারখানা। চাইলে ওরাই আবার দেখতে পারেন।

প্রঃ—দেখুন, গভর্নমেন্টের ইনস্পেকশনের উপর আমাদের আস্থা নেই। আর কেন নেই ভূপালের ঘটনা থেকে আপনিও অনুমান করতে পারছেন। অতএব আমাদের দাবী আমাদের তরফে একটি বিশেষজ্ঞ দলকে ওই কারখানা পরিদর্শনের অনুমতি দিন।

উঃ—না। আমাদের তেমন কোন আইন নেই।

এরপর একটু বিরক্তির সাথেই বলতে বাধ্য হলাম—"কারখানা এলাকার মানুষ মনে করছেন ওই কারখানার মধ্যে এমন কিছু হয় যা তাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। অতএব তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনাদের উচিত কারখানা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া।

উঃ—না। তা কখনই সম্ভব নয়।

প্রঃ—দেখুন, একটু ভেবে ওপরওলার সাথে কথা বলে তারপর জানান।

উঃ—বলছি তো সম্ভব নয়।

প্রঃ—সম্ভব নয় মানে? আপনারা এখানকার জল মাটি বাতাস মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে কারখানা চালাবেন। মুনাফা করবেন। অথচ ওই এলাকার মানুষ আপনার কার্যকলাপে বিপন্ন বোধ করলে তাদের কাছে আপনাদের কোন দায় নেই জানাবেন—এ কেমন ধরনের তুঘলকী বিচার?

উঃ—আমি দুঃখিত। কিছু করার নেই।

প্রঃ—বছরে আপনার কোম্পানী কত টাকা লাভ করে ওই কারখানা থেকে?

উঃ—সঠিক বলতে পারব না। Annual Report-এ আছে, দেখে নিতে পারেন।

টেবিলের উপর একটি রিপোর্টের দিকে দেখালেন। হাতে নিয়ে দেখলাম ছিয়াত্তর কি সাতাত্তর সালের রিপোর্ট। জিজ্ঞাসা করলাম—"নতুন রিপোর্ট পেতে পারি কি?"

উঃ—না।

এরপর আর কথা চালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না বুঝলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম এবং স্মারকলিপি ও স্বাক্ষরের কাগজগুলি হাতে দিলাম। বললাম—"আমাদের কথা এতে লেখা আছে। আপনাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে এটি পেঁৗছে দেবেন আশা করছি। আর যাবার আগে আর একবার বলছি—নীচে অপেক্ষা করে আছেন আমাদের বন্ধুরা। ওরা জানতে চাইবেন ভুপালের ব্যাপারে আপনারা কি বললেন। কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে একেবারেই মুখ খুললেন না। এমন কি সাধারণ সৌজন্যমূলক সহানুভূতিটুকুও জানালেন না। তাহলে কি আমরা এ ধারণা নিয়েই যাব এবং আমাদের বন্ধুদের সে কথাই জানাব যে—ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর মনোভাব এইরকমই?

উঃ—সে আপনি যা ভাল মনে হয় করবেন।

ফেরার জন্য মুখ ঘোরাতেই দেখলাম পুলিশের লোক কজন এতক্ষণ আমাদের সোফার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গ নিলেন। লিফ্‌টে একসাথেই নামলাম। নামতে নামতে ভাবছিলাম ভদ্রলোকটির কথা।—কলের পুতুল যেন। নির্লিপ্তভাবে বলে গেলেন সব কথা। নেহাৎ চাকরির স্বার্থেই আমাদের সাথে এমন বেয়াড়া আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হল বেচারাকে।

পাঁচ-সাত হাজার মানুষ মারা গেল। লাখখানেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে ধুঁকছেন।—কোন অপরাধ ছিল না তাদের। অপরাধ শুধু কারখানার আশপাশের এলাকায় বাস করা। বিশ্বসুদ্ধু লোক সেজন্য শোকাহত। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন অনেকে দায়ী কোম্পানীর বিরুদ্ধে। এই লোকটি সেই কোম্পানীরই চাকুরে একজন। ইনি নির্বিকার। এনার চেতনায় নাড়া পড়েনি এতটুকু। পড়লেও মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম সে। তাকে ওপর থেকে ভয় দেখানো হয়েছে এমনও নয়। ভয় নিজের ভেতরেই। ভয় সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে। কারণ সে তার সমগ্র সত্তাটাই জিম্মা দিয়ে বসে আছে ওই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীটির কাছে।

লোকটির আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়নি। যথেষ্ট ধৈর্যের সাথেই আমাদের সাথে আলাপ চালিয়ে গেছেন। তবে উপেক্ষার ভঙ্গীতেই। এটাই এদের বৈশিষ্ট। তার ধারণা এটাই শিষ্টাচার। এভাবেই মানুষের এবং নিজের মর্যাদা রাখতে হয়। কারণ সে Union Carbide এর মত জগৎ জোড়া খ্যাতি(!) সম্পন্ন সংস্থার একজন প্রতিনিধি। সে নিজেও সেই prestige-এর অংশীদার। সেই মর্যাদা রাখতেই তার এমন অনমনীয় অহংকারী মনোভাব। এই ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাছে মানুষের মূল্য কতখানি আমরা সকলেই জানি। আর এভাবেই এমন সব বড় বড় দেশী ও বিদেশী সংস্থার Organisational psyche ব্যক্তিমানুষে প্রসারিত হয়। কখন ব্যক্তিমানুষটি এমন dehumanized অবস্থায় নেমে আসেন নিজেও টের পান না।—তবে বিচলিত হতে জানেন সেই কর্পোরেশনের prestige বিপন্ন হলেই। ডিহিউম্যানাইজেশনের শিকার অবশ্য শুধু উনিই নয়, আমরা সকলেও। আমরা যারা ওঁর সাথে ভুপালের ঘটনা নিয়ে এত কথা বললাম, আমরাই তার পর আবার অন্য পাঁচটা ব্যাপারে গা ভাসিয়ে ভুপালের লোকেদের কথা আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি। এই ডিহিউম্যানাইজেশনটাই ওদের ক্ষমতার অন্যতম উৎস। পরস্পরের হাত ধরে এর থেকে যতদিন না আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি মালটিন্যাশনাল মেজাজ ততদিন নরম হওয়ার নয়।

—রবীন চক্রবর্তী

With best compliments from :

M/S Majumder Construction

Suri (Dangal Para)

Birbhum

Phone No. Suri—328

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান রাখুন

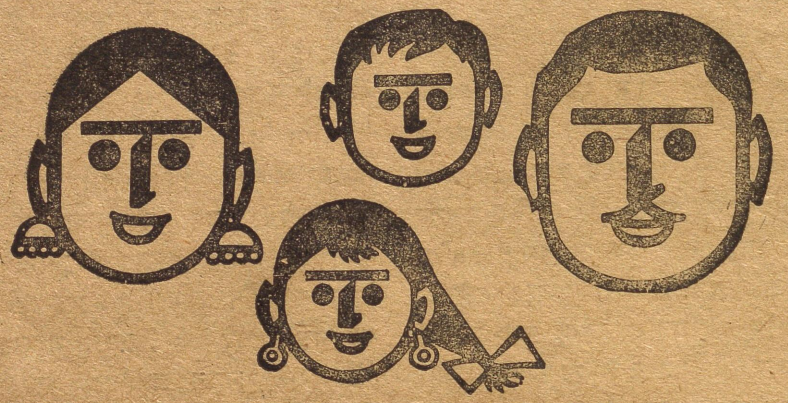

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

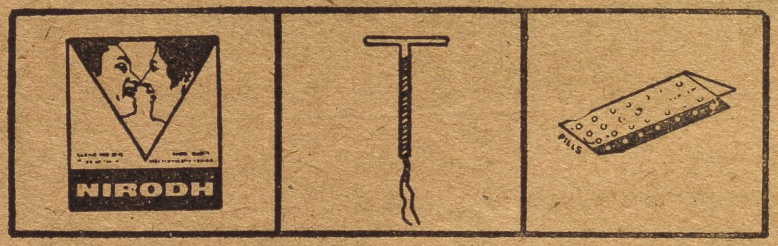

যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

davp 84/225

আমি প্রযুক্তি বলছি

আমার নাম 'প্রযুক্তি'। অনেকে 'আধুনিক প্রযুক্তি'ও বলে। আরও ডাকনাম আছে। যেমন, 'লাগসই প্রযুক্তি', 'মাঝারি প্রযুক্তি' ইত্যাদি।

আজকের দুনিয়ায় আমার নাম জানেনা বা শোনেনি এমন লোক পাওয়া ভার। দক্ষিণ গোলার্ধের লোকেরা অবশ্য সবে শুনতে শুরু করেছে। উত্তর গোলার্ধে অবস্থা এমন নয়। সেখানে আমি খুবই পরিচিত। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ব্যাপারটা বুঝেছ নিশ্চয়ই। আসলে যে কারণেই হোক পৃথিবীর তাবৎ ধনী ও উন্নত দেশগুলি পড়েছে উত্তর গোলার্ধে। আর দক্ষিণভাগে যত গরীব দেশ। গোলার্ধ ভাগাভাগির ব্যাপারটা ভূগোল সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে সেখানে গোলার্ধভেদে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি কিভাবে পরিবর্তিত হয় এসব রয়েছে। এই ভেদাভেদের ব্যাপারটা আউট অব সিলেবাস।

তবে হ্যাঁ, রেডিও টি-ভি খবরের কাগজ মায় পোস্টার অবধি মাস মিডিয়াগুলির দিকে চোখ-কান যাদের খোলা তারা ব্যাপারটা জানে। সেখানে ভাগটা প্রথম ও তৃতীয় বিশ্ব, এইভাবে। এই বিশ্ব ভাগের ব্যাপার সর্বত্র দেখবে। যেমন গেলবারের একটি নির্বাচনী দেওয়াল-লিখনে দেখেছিলে বোধহয়। লেখা হয়েছিল—ভারতকে তৃতীয় বিশ্বে এক নম্বর শক্তিশালী দেশ করে তুলতে... ভোট দিন।

মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীগুলি আমার মালিক। প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতেই এদের ঘাঁটি। তোমাদের দেশেও ছোট-ছোট খুঁটি আছে। নামে অথবা বেনামে। প্রথম বিশ্বে আমার রমরমা অবস্থা। সেখানকার মানুষ চুটিয়ে ভোগ করছে জীবন, আমার দৌলতে। যা সে চাইছে হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছি।

দুঃখ হয় আমার—তৃতীয় বিশ্বে তোমাদের মত গরীব দেশগুলির দিকে তাকালে। তোমাদের এত বিশাল জনসংখ্যা, এত বিরাট আয়তন, এত প্রাকৃতিক সম্পদ—সবচেয়ে বড় কথা হল এত বড় বাজার। অথচ তোমাদের কিনা এই হাল? আমার দুঃখ আমি তোমাদের কাজে লাগতে পারছি না ইচ্ছেমত। তেমন ভাবে লাগতে পারলে তোমাদের ভোল পাল্টে যেত। কি যে তোমাদের এক মাল্টিন্যাশানাল-ফোবিয়া!

অবশ্যি তোমাদের দেশের মনিবরা আমাদের পক্ষেই রয়েছে। আমার মনে আছে ষাটের দশক অবধি যখন তোমরা সকলে হু হু করে স্বাধীনতা পেতে থাকলে তখন তোমাদের মধ্যে সে কি উল্লাস। ভাবলে, আর চিন্তা নেই। স্বাধীনতা মিলে গেছে। বাকি—অর্থ-নৈতিক মুক্তি। তার জন্য আছে হালফিল প্রযুক্তি। কথামালার দৈত্য সে। যা বলবে নিমেষে এনে দেবে হাতের মুঠোয়। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল আমার জয়গান—"উন্নত প্রযুক্তি মানে প্রগতি।" স্বপ্ন দেখলে পশ্চাদ্‌পরতার ফাঁকটাকে বুজিয়ে দেবে উৎপাদনের গতি দিয়ে। প্রযুক্তি দিয়ে জয় করবে সময়ের ফারাক।

সেই মতো পেটে কষি বাঁধলে এঁটে। যাহোক করে জড়ো করলে প্রচুর সম্পদ ও শক্তি। কিনে আনতে থাকলে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা। স্বীকার করি—মূল্য কিছু বেশী দিতে হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ সেটা কি খুব অমূলক। এত বিরাট সমস্যার সাগর এত সহজে পেরোবে, তারজন্য কিছু বাড়তি মূল্য দেবেনা? তবে হ্যাঁ, তোমাদের উৎসাহের বহরটা একটু বেশীই ছিল। আগ্রহের আতিশয্যে যাহোক উপড়ে নিয়ে এসেছ সাহেবদের দেশ থেকে। কি কিনছ, কেন কিনছ, কোথায় লাগাবে, আদৌ লাগবে কিনা—কোন বাছ বিচার ছাড়াই। তারপর সেগুলি নিয়ে বসিয়েছ যত্র তত্র। শুনেছি ওপর মহলে লবিং-এর জোরে যে যার এলাকায় বসিয়ে নিয়েছে সেগুলি।

তবে হ্যাঁ, তোমাদের মনিবদের বাহাদুরী আছে। দেশের লোককে কি বুঝিয়েছে কে জানে? পেটে কিল মেরে পড়ে আছে। —কবে শিকে পড়বে ছিঁড়ে সেই আশায় মুখে রা-টি নেই।

তোমাদের উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘও পিছিয়ে থাকেনি। 1963 সালে তো এক বিশাল সম্মেলনই ডেকে বসল। কি অবাক কাণ্ড। কোথায় সৈন্য পাঠাতে হবে সে আলোচনার জন্য নয়। লড়াই থামানোর জন্যও নয়। এমনকি আর একটা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্যও নয়। বিষয়—আধুনিক প্রযুক্তি কিভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাই নিয়ে। Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit of less Developed Countries—সংক্ষেপে ACAST।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। Science এবং Technology শব্দ দুটো এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না আমার। বিশেষ করে এখন মানুষ Science-এর নামে যা করছে তা আমার ঘাড়ে চেপেই করছে যখন। তাই শুধু Technology বলাটাই আমি পছন্দ করি।

ওই ACAST অনেক বিবেচনা করে তিনটি ফরমান জারী করলেন। এক, গবেষণার কাজ (বিশেষ করে উন্নত দেশে) অনুন্নত দেশের সমস্যা ও চাহিদার কথা মনে রেখে করা হোক; দুই, নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা হোক; এবং তিন, সমস্ত নয়া প্রযুক্তিজ্ঞান যাতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ নিজেরাই কাজে লাগানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্য

সেখানে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ গড়ার কাজে সর্বতোভাবে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

এই ফরমানে আমার মালিক বহুজাতিক সংস্থারা হাতে চাঁদ পেল। নেমে পড়ল গরীব দেশের সেবায়। তারপর 1971 সালে ACAST এক মাস্টারে প্ল্যান ফাঁদলেন। যার নাম হল World Plan of Action। এই ছকে পড়লো তাবৎ শিল্প, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, যানবাহন, যোগাযোগ—একেবারে কনভেয়র বেল্ট সিস্টেমে তরতরিয়ে এগিয়ে চলবে এমনই প্ল্যান। মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীগুলোর ব্যবসা পাকা হয়ে গেল। তোমরা অবশ্য ভেবেছিলে অন্যরকম। অপুষ্ট দেহে বিদেশী প্রযুক্তির হাওয়া লেগে শুকনো হাড়ে একবার মাংস গজাতে শুরু করলে আর ভাবনা কি? তারপর তো খোকা নিজের পায়ে হেঁটে চলে বেড়বে।

বাস্তব ক্ষেত্রে ফল মোটেই তেমন হল না। সব দোষ চাপল বিদেশী প্রযুক্তির ঘাড়ে। আমার কথা হল—যদি এই প্ল্যান কাজের না হয় তো জাপান কি ভাবে এমন চড়চড়িয়ে এগিয়ে গেল? আসলে নিজেদেরও মুরোদ কিছু থাকা চাই। না পেরে এখন হাজারো বাহানা তোলা হচ্ছে। যেমন, একদল লোকের মুখরোচক যুক্তি হল—প্রযুক্তি যেই দেশে উদ্ভাবিত হচ্ছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সেই দেশের বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ থেকেই যায়। ভিন্ন পরিবেশে তা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। এদের অভিযোগ, বেশীর ভাগ, তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিদেশী প্রযুক্তি বদ-হজম হয়েছে। সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খাপ খেয়ে উঠতে পারেনি মোটেই। ফলে গোটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই নাকি তালগোল পাকিয়ে গেছে।

এক দশকে যে কি হল লোকগুলোর! ষাটের দশকে ছিল এত উৎসাহ। সত্তরের দশক পড়তে না পড়তেই ভোল গেল পাল্টে। 'উন্নতি' মানেই যে 'অগ্রগতি' নয়—একথা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে বেশ কিছু লোক। কত সেমিনার সিম্পোসিয়াম হচ্ছে এ নিয়ে। এই সেদিন 1983 সালের সেপ্টেম্বর মাসে World Fedetion of scientific workers-এর উদ্যোগে প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা হল। বিষয়—Science and the Crises of Devolopment। এখানেও দেখ শিরোনামে Science থাকলেও মারটা এসেছিল প্রযুক্তির খারেই। বাজার ছেয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ের বইয়ে। Gunder Frank, Bernstein, O'Brien, Graham Jones, David Dickson, Samir Amin, Denis Goulet, Ward Morehouse ইত্যাদি লোকজন মোটা মোটা বই লিখে ফেলেছেন এই বিষয়ের উপর।

হঠাৎ এদের খেয়াল হয়েছে বিদেশী প্রযুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির নামে নতুন ধরনের দাসত্বের কলে আটকা পড়ছেন তারা। প্রচুর অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আনতে। দেশের মাটিতে সেগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতায় চলছে না কখনই। ব্যারাম লেগেই আছে। তার জন্য আবার বিদেশী কোম্পানীর দ্বারস্থ হওয়া। আবার অর্থদণ্ড। এদিকে যে পরিমাণ টাকা ঢালা হচ্ছে সে পরিমাণ লোকের চাকরী হচ্ছেনা। সব মিলিয়ে হতাশাজনক অবস্থা। তাই যত রাগ।

দেখ ভাই আমি ভদ্রলোক। বেইমানি জানি না। যার খাই তার দিক ঘেঁষেই কথা বলি। আচ্ছা, তোমরা কি জানতে না যে আমার ওপর মালিক আছে? জানতে না মালিকদের চরিত্র? সে তো দাঁত কামড়ে তার মালিকানা রক্ষা করতে চাইবেই। আর তাতে অপরাধটাই বা কোথায়? সেও তো ব্যবসা করতে নেমেছে। এটুকু লাভের আশা ছিল বলেই না কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢেলেছে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে। হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেছে আমায়। এখন তুমি তার ভাগ নেবে—মূল্য দেবে না? এদিকে তোমাদের দেশে আমার মালিককে নিয়ে কত কেচ্ছাই না ছড়াচ্ছ। ফলে 'Import' কথাটা শুনলেই অনেকে চটে উঠছেন। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় এই ধরনের লেনদেন ছাড়া কি কোন দেশ টিকতে পারে? অবুও আমার মালিক বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। প্রযুক্তির ব্যাপারে এখন আর 'Technology Import' কথাটি শুনবে না। এখনসব Technology Transfer হচ্ছে। আমদানী নয়, হস্তান্তর। হাতবদল। তার হাতে ছিলাম। তোমার হাতে চলে এলাম। শুনতে খুব ভালো লাগছে না?

নিন্দুকরা বসে নেই। তারা এর মধ্যেও গণ্ডগোল বের করেছে। দেখ, Transfer মানে বাজারে গিয়ে খালি বেচে চলে আসা নয়। এর অর্থ ক্রেতাকে সব শিখিয়ে বুঝিয়ে পড়িয়ে এই প্রযুক্তির উপযুক্ত করে গড়ে দিয়ে আসা। এতে খারাপটা কি থাকতে পারে? কিন্তু ঐ নিন্দুকদের বক্তব্য, এখন আর শুধু যন্ত্র নয় এর সাথে ideology-ও সেল করা হচ্ছে। নতুন ধরণের Social Control চালানো হচ্ছে। Technology এখন আর নিছক একটি Product নয়—একটি Process। যার অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যেই উপ্ত একটি বিশেষ আর্দশের বীজ। যা একটি কেন্দ্র থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। আবার Technology Transfer পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি মুষ্টিমেয় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনাধীনে চলে আসছে।

কথাটা খুব অসত্য নয়। তবে যা একবার গিলেছ তা আর ওগড়াবে কিভাবে? আমার বৈশিষ্ট্য অনেকটা living species-এর মত। মাটিতে একবার পা দিতে পারলে ডালপালা ছড়াতে শুরু করি। Technology continues to breed its own variety। তাই আমার পরামর্শ, ওদের সঙ্গে বিবাদ নয়। একটু মানিয়ে চল। শুনেছি তোমাদের নতুন মনিব এসেছে। সে-ও নাকি সেটাই পছন্দ করে। ভালই হয়েছে।

তবে কি জান—তোমাদের অবস্থাটা বড়ই বেয়াড়া ধরনের। সেজন্যই আমার পুরো ফর্ম দেখাতে পারছিনা। জান তো—'আধুনিক প্রযুক্তি'র জন্য চাই, 'আদর্শ' বাজার'। বাজারে প্রচুর ক্রেতা থাকবে। তাদের পকেটে থাকবে অঢেল টাকা। কোথা থেকে আসবে জানিনা। ধর এমনিতেই এসে যাবে। চাকরীর জন্য হাহাকার থাকবে না—যা হাহাকার থাকবে তা কেবল ভোগ্য পণ্যের জন্য। তাহলেই ফুঁড়ে বেরোবে আমার প্রতিভা। একটা কথা বলব? দেশ থেকে গরীবগুলোকে হটিয়ে দাও একবার—আমিও দেখিয়ে দেব একহাত।

—ডক্টর বিচক্ষন

ড্রাগ কনভেনশন ঃ যা মনে হল

ড্রাগ এ্যাকশন ফোরামের কনভেনশন হল। গত বিশে জানুয়ারী। মৌলালী যুব কেন্দ্রে। ফোরামের পরিচয় আগেই পেয়েছেন। 'বি-ও-বি'র পাতাতেই (জুলাই-অক্টোবর 1984 সংখ্যা)। অনেকেই এসেছিলেন। তিনশ জনের উপর ডেলিগেট হয়েছেন। আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটাতে সামান্য আর্থিক সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ডেলিগেট ফি দশ টাকা ; ছাত্রদের জন্য পাঁচ টাকা। সারাদিনের প্রোগ্রাম। বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে ছ'টা। তিন পর্যায়ে। সকালে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের ভাষণ। যার মধ্যে ছিলেন ডাঃ রণেন সেন, বাংলাদেশ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরী, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জী, আই. এম. এ.-র সভাপতি ডাঃ এস. বি. চক্রবর্তী। ফোরামের তরফে বক্তব্য রেখেছেন ডাঃ সুজিত দাস। এরপর লাঞ্চ ব্রেক এবং ক্রমান্বয়ে ডেলিগেট সেশন ; চা পানের বিরতি ; এবং সন্ধ্যায় কণ্ট্রাসেপটিভ ড্রাগের ওপর সেমিনার।

সকলেই স্বীকার করেছেন প্রচার, আপ্যায়ন, আদবকায়দার বিচারে আমাদের মত 'অসংগঠিত' সংগঠনকারীদের পক্ষে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানের আগে ছাপানো কার্ডে প্রচার, সুদৃশ্য পোস্টার, ক্যালেণ্ডার,—'মানুষের জন্য ওষুধ, না ওষুধের জন্য মানুষ' পুস্তিকা প্রচার, সাংবাদিক বৈঠক—সব হয়েছে। কাজ হয়েছে তাতে। বহু ব্যক্তি ও সংগঠন নিজে থেকে এসে ডেলিগেট হয়েছেন। বক্তব্য রেখেছেন নির্দিষ্ট সেশনে। যদিও সময় ধার্য ছিল খুব কম। প্রত্যাশিত পরিসরে বক্তব্য রাখতে পারেন নি। তথাপি অখুশি হয়েছেন এমন নয়। অসুবিধের কথা বুঝেছেন। সব নিয়ে—সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে কনভেনশন।

এরপর যদি প্রশ্ন করেন কনভেনশনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি ? —স্বভাবতঃই এর উত্তর ব্যক্তি ও সংগঠনভেদে ভিন্ন হবে। তবুও এই আলোচনা তুলছি। তুলছি, কারণ এই নয় যে বিতর্কের ঝড় তুলতে চাই। আসলে এমন উদ্যোগ আরো হবে।—এবং চাইব সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়োজিত সময় অর্থ শ্রমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হোক।

কনভেনশনের মুখ্য কর্মসূচী ছিল ওষুধের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত একটি খসড়ার উপর আলোচনা এবং কর্মসূচী রচনা। কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে কাদের কাছ থেকে ঠিক কি চাইছেন এবং কর্মসূচী সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি। বলেন নি মানে ইচ্ছে করে বলেন নি তা নয়। আসলে নিজেরাও খুব স্পষ্ট করে জানেন মনে হয় না সকলকে নিয়ে একসাথে চলতে চাইছেন। গণতান্ত্রিক প্রথায় এগুতে চেয়ে এমন একটি আলোচনা দরকার মনে করেছেন। এবং তার আয়োজন করেছেন।

ভালোই হয়েছে। এই অবধি ধরলে সার্থক হয়েছে আয়োজন। সুযোগ পেয়েছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু সংহার কর্মীরা একত্র হওয়ার এবং পরস্পরের মনোভাব জানার। বক্তব্য রাখতে উঠে সকলেই 'একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে' ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম নামক আর 'একটি সংগঠনের প্রতি' বক্তব্য রেখেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, সাংগঠনিক সীমানাবোধ প্রখরভাবে কার্যকর ছিল সকলের ক্ষেত্রেই। খসড়ার নানা অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন শুধুমাত্র শহুরে লোকজনের মধ্যেই প্রচার সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ওষুধের বিষয়টি সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে না রাখলে উদ্যোগ সার্থক হবে না। অনেকে এমনও অভিযোগ করেছেন—দেশের যে মুষ্টিমেয় মানুষ ওষুধ কিনে খেতে পারে ফোরাম তাদের দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছে।—যারা পারে না তাদের বিষয়ে ফোরাম কি ভাবছে ? ইত্যাদি।—অনুমান করুন, 'বেচারা' ফোরামের দায়িত্ব কোথায় গিয়ে ঠেকেছে !

এখন প্রশ্ন এতসব পরামর্শ নিয়ে ফোরাম এবার করবে কি ? উদ্দিষ্ট 'সংগঠন'টি কোথায়, যার মাধ্যমে 'এই সংশোধিত খসড়া' বাস্তবায়িত হবে ? যোগদানকারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা' একটি 'সংগঠনের আহ্বানে' এসেছিল এবং 'ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের নতুন শুভ উদ্যোগে' সাধুবাদ জানিয়ে গেছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যাঁরা, 'সংগঠন' হিসেবে 'আইডেণ্টিফায়েড' হতে পেরে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। ফলে পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে দু'পক্ষই তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেছেন। কাজটি কিভাবে হবে, কে করবে সে বিষয়ে মাথা ঘামালেন না কেউই। অথচ সে কাজটিই ছিল সবচেয়ে জরুরী।

আসলে ফোরাম তাদের সাংগঠনিক অক্ষমতার বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তিটি করতে পারলেন না। বলতে পারলেন না—দেখুন, আমরা কতিপয় প্রফেশনাল ড্রাগের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি এবং আপনাদের বিবেচনার জন্য তুলে ধরলাম। আপাততঃ আমাদের দায়িত্ব শেষ। এখন আপনারা যদি মনে করেন বিষয়টি সঠিক তাহলে আপনারা এগিয়ে এসে কাজটি নিন। যে যেখানে আছেন—সে মধ্যবিত্তের মধ্যে, কি শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে, যে যার নিজের অবস্থানে থেকে উপযোগী ভাষ্য প্রস্তুত করে প্রচারে নামুন।

আন্দোলন করুন। গণসংগঠন যাদের আছে তারাই পারেন একাজ করতে।—আর আমরা সাধ্যমত নিজেদের বিশেষ অবস্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজ করে আপনাদের সাহায্য করব। এর বেশী দায়িত্ব নেওয়া আমাদের সম্ভব নয়।' —ফোরামের তরফে সবচেয়ে উপযোগী কথা ঘোষণা বোধহয় এটাই ছিল। কিন্তু বলতে পারেন নি। বোধহয় কনভেনশনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এইখানেই। ফলে খুশির মেজাজ নিয়ে কনভেনশন শেষ হল, কিন্তু পরদিন থেকে কার কি কাজ কেউ জানল না। উদ্যোক্তারা যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। 'হিউজ টাস্কের' বোঝা নিয়ে দিশেহারা ছিলেন। ভাবছিলেন ভার কিছুটা লাঘব করবেন। পারলেন না। বরং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিলেন। কমিটমেণ্ট বেড়ে গেল।

কেন পারলেন না—সে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। তাঁরা করবেন সে কাজ। তবে কাছ থেকে দেখে মনে হয়েছে—একটি 'কেন্দ্রীয় সংগঠন' হিসেবে গড়ে ওটার ক্ষীণ স্বপ্ন এবং এই মুহূর্তের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বর্তমান কিছু দ্বিধা ও সংশয় এজন্য দায়ী। শুরুতে একরকম ভাবা হয়েছিল। টানাপোড়নে কাজের ধরন বদলেছে। আলগাভাবেই কিছু কিছু কাজ এগিয়ে চলেছে। সংশয় কাটছে না। আঁটোসাটো বাধন না থাকায় হতাশ হচ্ছেন অনেকে। তবে গায়ে গতরে খাটছেন যারা, বুঝতে পারছেন বাধন কষলেই কাজের বেগে ভাঁটা পড়বে। উপলব্ধি করছেন আলগা বলেই সীমানার তোয়াক্কা না করে কাঁধ ভাগাভাগি হয়ে উতরে যাচ্ছে কাজ। সেদিনের এত লোকের সাড়া দেওয়ার কারণও বোধহয় এই ঢিলেঢালা ভাব। সীমানা যত নির্দিষ্ট হবে, এক্তিয়ারের প্রশ্ন তত প্রবল হবে। দৃঢ় হবে সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যবোধের বেড়া। কথাটি অনেকেরই মনঃপূত হবার নয় সহজে, তবে ভেবে দেখার মনে হয়।

সাংগঠনিক প্রশ্নে ফোরামের এই দ্বিধা ও সংশয়ের প্রতি কটাক্ষ করছি না। বরং এই 'দ্বিধা', পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং বিষয় ভেদে সাংগঠনিক বিষয়কে নতুন আলোকে ভাবনার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি বলে মনে করছি। এই 'দ্বিধা' বোধহয় এই উদ্যোগের একটি ইতিবাচক দিক।

ড্রাগ ফোরামের খসড়া নিয়ে আলোচনা এখানে আপাততঃ রাখলাম না। কনভেনশনের আয়োজন পর্বে গোটা ভার যে ক'জন বন্ধুর ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেছে তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

——

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী

ফর্ম IV বিজ্ঞপ্তি

1. প্রকাশন স্থান : 52/9c বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-700 012
2. প্রকাশনার পর্যায়কাল : দ্বিমাসিক (দু'ই মাসে একটি সংখ্যা)
3. মুদ্রকের নাম : রবীন মজুমদার
   ভারতীয় কিনা : হ্যাঁ
   ঠিকানা : কেমিকাল টেকনোলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; 92 আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-700 009
4. প্রকাশকের নাম : রবীন মজুমদার
   ভারতীয় কিনা : হ্যাঁ
   ঠিকানা : উপরোক্ত
5. সম্পাদকের নাম : রবীন মজুমদার
   ভারতীয় কিনা : হ্যাঁ
   ঠিকানা : উপরোক্ত
6. স্বত্বাধিকারী/ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা : হিরণ্ময় সাহা, পি 40 শ্রীভূমি, কলিকাত-700 048

আমি, রবীন মজুমদার, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার

প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ঃ সেই উৎসাহ কোথায় গেল ?

ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি হরিণঘাটা শাখার সম্পাদক শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস চিঠি দিয়েছেন গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের আহ্বায়ককে। তেসরা জানুয়ারী, 1984 তারিখে লেখা চিঠিটির একটি অনুলিপি পাঠিয়েছেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মীর দপ্তরেও। বি-ও-বি কে লিখেছেন, "গণবিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহী সংগঠন ও ব্যক্তিগণের সহযোগিতা ও মতামত সংগ্রহের জন্য উক্ত অনুলিপিটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ রাখছি।" গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের বিষয়ে সবরকম প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বি-ও-বি বিশেষভাবে আগ্রহী। শ্রী বিশ্বাসের চিঠির অনুলিপি তাই প্রকাশ করছি এই সংখ্যায়। এ রাজ্যে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা হোক, উদ্যোগ বাড়ুক— বি-ও-বি তার সাধ্যমত সে উদ্যোগে অংশ নেবে।

সঃ সঃ, বি-ও-বি

প্রিয় সাথী

নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এখন থেকে বছর তিনেকেরও পূর্বে 1982 সনে গনবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র তৈরী হয়। ঐ বৎসর খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে হিরোসিমা দিবস পালিত হয়। 1983 সনেও হিরোসিমা দিবস পালিত হয়, যদিও আগের তুলনায় তা অনেকটা নিষ্প্রভ ছিল। এছাড়া ঐ বৎসর দুর্গাপুর পিপল্‌স সায়েন্স ফোরাম ও ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি দুর্গাপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ দূষণ ও নিউক্লীয় অস্ত্র বিরোধী সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে এবং খড়গপুরে বিজ্ঞান পদযাত্রায় অংশগ্রহণ (সম্ভবত) করা হয়েছিল। 1984-তে এসে এ ধরনের অনুষ্ঠানের উদ্যোগে নেয়া বা অন্যান্য কোন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের খবর আমরা জানিনা।

একটা প্রাথমিক ভাবনাচিন্তার ঐক্য থেকে 1982-তে হিরোসিমা দিবসের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র তৈরী হলেও আমরা আশা করেছিলাম বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটবে। আর এই গণবিজ্ঞান আন্দোলন ক্রমে সমাজ পরিবর্তনকামী শক্তির অংশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এব নির্দিষ্ট দায় দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের কাজে আমরা দিন দিন উৎসাহের অভাবটাই লক্ষ্য করছি।

তবে আশা পূরণ না হলেও আমরা আশা ছাড়িনি। এ অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন জানতে আশা রাখি। গনবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী সংগঠন ও পত্র পত্রিকাগোষ্ঠী এবং উক্ত সমন্বয় কেন্দ্র বহির্ভূত গণবিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন এমন সংগঠন ও পত্রপত্রিকা গোষ্ঠীর কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন আপনারা একটা ঐক্যবদ্ধ গণবিজ্ঞান আন্দোলনের রূপরেখা তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ নিন এবং গ্রাম গঞ্জে-শহরে গড়ে ওঠা গণবিজ্ঞান ভাবনা চিন্তা থেকে উদ্ভূত সংগঠনগুলিকে পথ দেখান।

ইতি—

ধন্যবাদ সহ

নিরঞ্জন বিশ্বাস

সম্পাদক

ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, হরিনঘাটা শাখা

পোঃ সুবর্ণপুর, জি-নদীয়া

এবারে কি তবে হেপাটাইটিস মহামারী ? কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

কলকাতায় ও আশেপাশের কয়েকটি জায়গা থেকে হেপাটাইটিসের উদ্বেগজনক রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে যেখানে অসুখটি দেখা দিচ্ছে সেখানেই বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে অনেকের ভিতর। অতি সম্প্রতি আন্ত্রিক মহামারী আর এনকেফেলাইটিসে ভুগলো এ রাজ্যের মানুষ। নানান প্রশ্ন এবং বিতর্কও উঠলো তা নিয়ে। এবারে কি তবে হেপাটাইটিস মহামারীর ধাক্কা ? আবারো কি একইরকম নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞতা আর শঠতার খেলা দেখাবে সরকারী দপ্তরগুলি, স্বাস্থ্যবিষয়ক নামী দামী সংস্থা আর আমলা তথা বিশেষজ্ঞরা ?

ভাইরাসবাহিত হেপাটাইটিস বিষয়ে একেবারে গোড়াকার কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য থেকে উদ্ধৃত করছি—যদি হেপাটাইটিস দেখা দেয় তবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য পাওয়ার আগে পাওয়ার আগে পর্যন্ত কাজে লাগতে পারে।

☐ সংক্রালক হেপাটাইটিসের কারণ হ'ল এক (বা একাধিক) ধরনের ভাইরাস, তবে এগুলির সম্পর্কে এখনো বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

☐ ভাইরাসগুলি বাহকের শরীর থেকে প্রধানত বেরোয় মলের মাধ্যমে এবং মানুষের শরীরে ঢোকে জল ও খাদ্যের মাধ্যমে। হেপাটাইটিস সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাই **প্রধান প্রতিষেধক পরিচ্ছন্নতা**। যিনি রোগীর সেবা করবেন তাঁকে প্রতিবার রোগীর কাছে যাওয়ার পর হাত মুখ ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশী থাকে রোগাক্রমণের গোড়ার দিকে।

□ শিশুরা সহজেই হেপাটাইটিসের শিকার হয়, তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণত রোগ বেশী জটিল রূপ নেয়।

□ গোড়ার দিকে রোগলক্ষণ অনেক সময় প্রকট হয় না। প্রধান প্রাথমিক লক্ষণ, খাওয়ায় অরুচি, খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধে বমি ভাব, ধূমপানে অনিচ্ছা। জ্বর হতেও পারে, নাও পারে। কখনো কখনো ডান দিকে যকৃতের কাছে ব্যথা ভাব বা অস্বস্তি থাকতে পারে। রোগ কিছুটা জেঁকে বসলে চোখ হাতের তলা হলুদ হতে থাকে, প্রস্রাব ঘন হলুদ অথবা বাদামী, পায়খানা সাদা হয়। রক্ত পরীক্ষায় রোগ সনাক্তকরণ সহজতর হতে পারে।

□ রোগীর চিকিৎসা ও সেবা যত্নের সর্বপ্রধান অঙ্গ পরিপূর্ণ বিশ্রাম। রোগলক্ষণ উপশমের পরও বিশ্রাম চলিয়ে যাওয়া দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কোনো উপশম হয় না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে—তবে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে।

□ রোগীকে প্রচুর তরল পানীয় খাওয়ানো দরকার বিশেষতঃ ফলের রস, গ্লুকোজের জল, আখের রস, ইত্যাদি। পেপে, ফল, ডাল, বীন্‌স, মাংস, এবং অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন, তবে তেল-ঘী ইত্যাদি স্নেহপদার্থ বর্জনীয়। মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার এবং রোগ উপশনের পরও দীর্ঘ সময় বর্জনীয়।

□ শিশুদের মাধ্যমে হেপাটাইটিস সংক্রামণের সম্ভাবনা খুব বেশী কারণ শিশুরা আপাত লক্ষণ ছাড়াই অনেক সময় রোগ বহন করে। আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সকলের পক্ষে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা একান্ত জরুরী। রক্ত নেওয়ার এবং ইনজেকশন দেওয়ার সূচের মাধ্যমে রোগজীবানু যাতে না ছড়ায় সে বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার।

সঃ মঃ, বি ও বি

রিপোর্ট

বামার লরী কারখানায় তিন ব্যক্তির মৃত্যু
এ. পি. ডি. আর এর তদন্ত

গত পনেরোই মার্চ শুক্রবার 43 নং হাইড রোডে বামার লরী কোম্পানীর গ্রীজ কারখানায় এক 'দুর্ঘটনায়' তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সংবাদটি প্রকাশের পর (বড় সংবাদ পত্রগুলিতে কোম্পানীটির নাম উল্লেখ করা হয় নি) গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ-পি-ডি-আর) একটি টীম ঐ ঘটনার তদন্ত করেন গত 17 মার্চ তারিখ। স্থানীয় লোকজনের এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলোচনা করে সমিতি একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন।

এই বিবৃতি থেকে জানা গেল কারখানার বর্জ্য রাসায়নিক ও গ্রীজ নির্গমনের নালিপথে একটি ঢাকনা দেওয়া গভীর কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়েই তিন যুবকের মৃত্যু হয়। নালাটি আগে পাম্পের সাহায্যে পরিষ্কার করা হত। কিন্তু পাম্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নির্গম পথটিকে হাতে পরিষ্কার করার ঠিকা দেওয়া হয় জনৈক বাবলু মন্ডলকে, যদিও কোম্পানী কর্তৃপক্ষের ভালই জানা থাকার কথা যে কুয়োটির সংলগ্ন অঞ্চলে ক্ষতিকর ভারী গ্যাস জমে থাকে এবং নালার ভিতর মানুষ ঢোকার কথা নয়। ঢাকা দেওয়া কুয়োটির এক দিকে একটি ফোকর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মানুষ ঢোকারপথ করা রয়েছে। উত্তম দাশ (সন্তোষপুর, বজবজ) ও তারপর গোপাল দে (পর্ণশ্রী পল্লী এক্সটেনশন) কুয়োর কাছাকাছি যেতেই চীৎকার করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কারখানার শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কিন্তু কেউই ঘটনার দিন প্রথমে পিটের ভিতর যাওয়ার সাহস পায় না। এই সময় বাবলু (মেদিনীপুর) ছুটে দড়ি নিয়ে এসে নালায় ঢোকে এবং সেও অচৈতন্য হয়ে কুয়োর ভিতর পড়ে যায়। পরে দমকল এসে কুয়োর ভিতর থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কোম্পানীর কাছ থেকে ঠিকাদার বাবলু ও তার সহযোগীরা গ্যাস নিরোধক কোনো সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য পায় নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ. পি. ডি. আর-সহ জনবিজ্ঞান আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলনের সকল কর্মী আশা করে—(ক) সমস্ত কারখানা এবং ঠিকাদারী সংস্থা পরিবেশ দূষণ এবং শিল্প-দুর্ঘটনা নিরোধক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) তিন নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে বামার লরী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং (গ) হাইড রোডের ঘটনার পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, এবং চীফ ইনস্পেক্টর অব ফ্যাক্টরীজের তদন্ত রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

তৃতীয় রেল

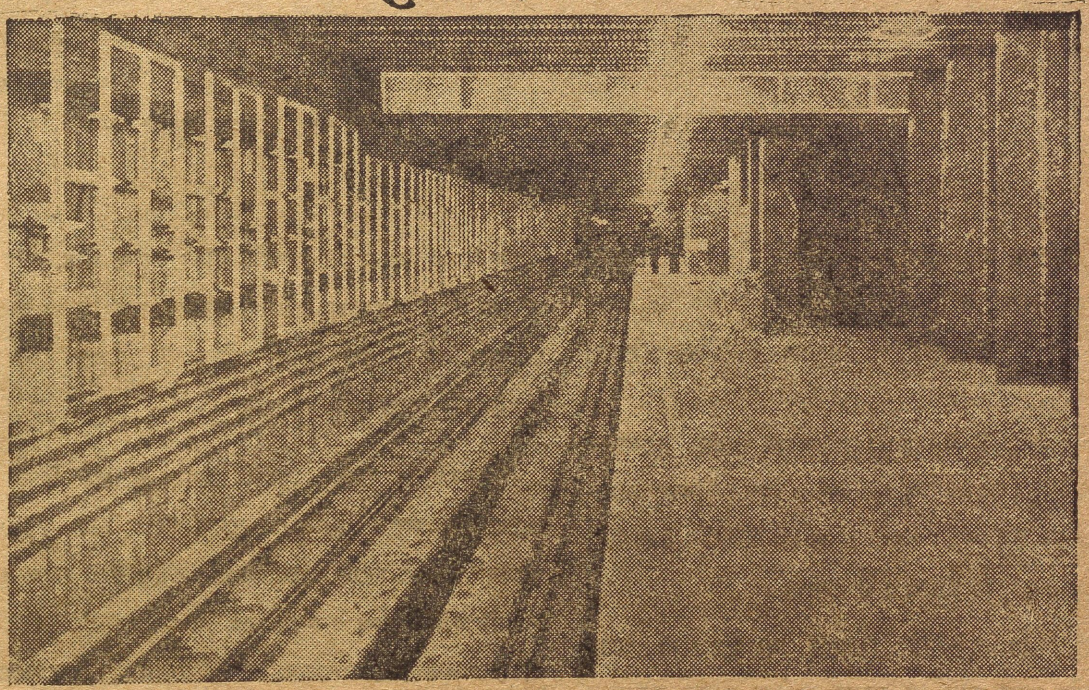

ইস্পাতে তৈরী দুটো লাইন পাশাপাশি চলতে চলতে, অনেক দুরে গিয়ে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে—রেলওয়ে বলতে এই ছবিটিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে।

মেট্রো রেলের ছবিটি কিন্তু অন্যধরণের। এখানে দুটো লাইনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আরও একটি লাইন। বিদ্যুৎবাহী তৃতীয় রেল।

মেট্রোরেল চলবে বিদ্যুতে। তৃতীয় রেলই ট্রেনে বিদ্যুৎ যোগাবে। এরজন্য এই রেলটি তৈরী হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের ইস্পাতে। কংক্রীটস্তরের ওপর বসানো চীনেমাটির ইনস্যুলেটরের ওপরে থাকবে এই তৃতীয় রেল।

মেট্রো রেল
কলিকাতা
(ভারত সরকারের একটি প্রকল্প)

medium

পত্রিকা পরিচিতি

জ্ঞান বিচিত্রা
আগরতলা, ত্রিপুরা
বিশেষ খাদ্য সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1984

প্রচ্ছদ ও পরিবেশনা সাদাসিধে অথচ আকর্ষনীয়। সংখ্যাটি পেছনে প্রচুর ভাবনা চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। পত্রিকাটির গড়ন খুব মনোগ্রাহী। নির্বাচিত বিষয়গুলি সাধারণ মনে হলেও সর্বদা প্রয়োজনীয়।

বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি সুন্দর রচনা উপহার পাওয়া গেলো—"শিশুদের খাবার", "রঙ দেওয়া খাবার খাবেন না", "কিছু আনুসঙ্গিক প্রশ্ন ও তার উত্তর", "ক্ষুধা ও ডায়াবিটিস" ইত্যাদি; ভিটামিন টু' বি অর নট টু'বি"-ও খুব উপভোগ্য।

"খাদ্য" আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে লেখাটি সংস্কৃতে যা আছে তা সাধারণের কাছে লুপ্ত হতে না দেবার দায়িত্ব পালন করেছে। "খাদ্য, হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিতে" লেখায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার সময়কালীন পথ্যে পেঁয়াজ, রসুন, হিং ইত্যাদি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা থাকাটা দরকার ছিল।

কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করে বাংলা প্রতিশব্দ দিলে ভাল হতো। যেমন পৃঃ 85তে সাইড এফেক্ট পৃঃ 96তে ওয়েস্টেজ, পৃঃ 99তে 'পারমিসিবল্ লিমিট' পৃঃ 109তে 'টিশ্যু'। ঠিক তেমনি কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ না দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত—যেমন প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট লেখা ব্যবহৃত উদজানের বদলে হাইড্রোজেন, অম্লজানের বদলে অক্সিজেন ইত্যাদি।

"কয়েকপদ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারে প্রস্তুত প্রণালী" প্রসঙ্গে বলি উথাপম্ তৈরীর বেলায় যথেষ্ট সময় দিয়ে ডালগুলি ভিজিয়ে তারপর রাঁধলে পুষ্টিমূল্য কিছুটা বাড়বে বোধহয়। আমলকীর চাটনীতে ভিটামিন সি রান্নার প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। শুক্তানিতে আদা, পোস্ত, তিল, আতপ চাল বাটা মিশ্রণ দিলে স্বাদে নতুনত্ব আসে কিন্তু আদা সরষেবাটার ছাঁকা রস বা শুধু পাঁচ ফোড়ন ভাজা গুঁড়ো দিলে অর্থসাশ্রয় হয়। ডালের পায়েসে নারকেলের দুধ দিয়ে খোসাগুলো ফেলে দিলে অনেকটাই অপচয় হল—খোসাগুলো মল তৈরীর কাজে সহায়তা করে।

কতকগুলি লেখা যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়ে রচিত হলেও পুরোপুরি সফল হয়নি। যেমন "প্রসূতিরা কী খাবেন ও কেন খাবেন" রচনায় চার্টে ক্যালরি প্রোটিন ইত্যাদির সাথে দুধ, ফল, ভাত, ইত্যাদি বলে উল্লেখ থাকলে এবং কি খাবে কতটা খাবে, কোন অবস্থায় খাবে তা এক নজরে দেখে কাজে লাগানোর মত করে পাওয়া গেলে ভাল হত। "খেলোয়াড়দের খাবার"-এতেও একই অসুবিধা। "চোখ ভালো রাখতে হলে কী খাবেন" রচনাটিতে vita A বেশী করে খাবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বেশী বেশী খেলে বিপদ হতে পারে সে বিষয়ে উল্লেখ থাকার দরকার ছিল। "পেটের রোগের কারণ ও তার প্রতিকার লেখাটিতেও মূল বক্তব্যটি পরিষ্কার বোঝা যায় নি। "ওষুধ খাদ্য নয়" নামকরণের সঙ্গে ভিতরের বক্তব্য সামঞ্জস্যহীন। "ক্ষুধা ও তৃপ্তির" ক্ষেত্রে পৃঃ 43-এর চার্টটি বাহুল্য।

পৃষ্ঠা 83 তে 'প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের' বদলে 'প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পদার্থ' হবে।

কোন খাবারে কী আছে খুব সুন্দর যোজনা—বিশেষতঃ এর বর্ণানুক্রমিক সজ্জিতরূপে। তবে পৃষ্ঠা 109 এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের "কোন খাবারে কী···4নং চার্ট দেখুন" অংশটি শিরোনামে রাখলে আরও ভাল হতো।

সব শেষে আবারো বলি এমন একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ সত্যই প্রসংশনীয়।

অনুরাধা বিশ্বাস

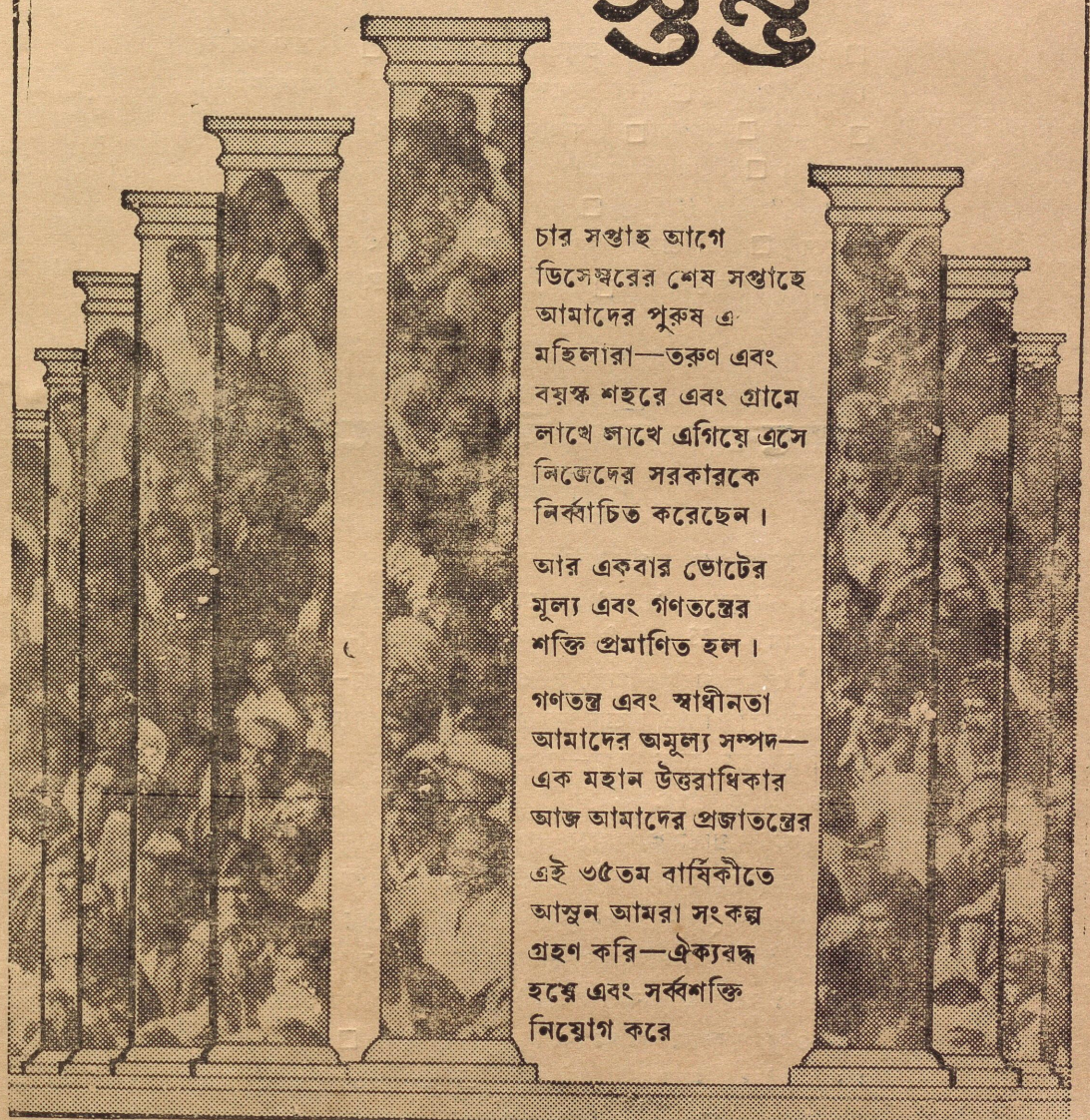

গণতন্ত্রের
লাখ লাখ
স্তম্ভ
চার সপ্তাহ আগে
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে
আমাদের পুরুষ ও
মহিলারা—তরুণ এবং
বয়স্ক শহরে এবং গ্রামে
লাখে লাখে এগিয়ে এসে
নিজেদের সরকারকে
নির্ব্বাচিত করেছেন।
আর একবার ভোটের
মূল্য এবং গণতন্ত্রের
শক্তি প্রমাণিত হল।
গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা
আমাদের অমূল্য সম্পদ—
এক মহান উত্তরাধিকার
আজ আমাদের প্রজাতন্ত্রের
এই ৩৫তম বার্ষিকীতে
আসুন আমরা সংকল্প
গ্রহণ করি—ঐক্যবদ্ধ
হয়ে এবং সর্ব্বশক্তি
নিয়োগ করে
আমরা তাকে রক্ষা করব

R.N.34929/79

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C, B.B. Ganguli Street, Calcutta-12

YEBR 8 NUMBER 4

Jan-Feb. 1985

পড়ুন ও পড়ান

□ উৎস মানুষ □ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) □ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) □ অঙ্কুরে শুরু □ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) □ অন্বেষা □ অহল্যা □ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) □ Manushi (দিল্লী) □ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) □ Science for the People (USA) □ Medico Friends' Circle Bulletin (পুণে) □ জনবিজ্ঞান (আসাম) □ বিজ্ঞান ও সমাজ □ জ্ঞান-বিচিত্রা (আগরতলা) □ Socialist Health Review

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

□ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস' এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত, যোগাযোগ P 239 A কিমার স্ট্রীট, কলিকাতা—700017) □ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজ সম্প্রদায়—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 23 চাঁদমারী রোড, কাঁচরাপাড়া) □ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64) □ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন-একটি প্রাথমিক খসড়া—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) □ পরিবেশদূষণ — স্বপন কুমার শীল (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) □ না হিরোসিমা-নাগাসাকি চাই না (দ্বিতীয় সংস্করণ) সৌমেন গুহ (পঃ বঃ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা) □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (বি-ও-বি সংকলন, পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) □ আন্তিক 84 : মানুষের তৈরী মহামারী (বাউলমন) □ প্রশ্ন উত্তরে বাছ বিচার (বাউলমন) □ বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য সংকলন (বাউলমন) □ বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান (উৎস মানুষ) □ বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (উৎস মানুষ) □ শেকল ভাঙার সংস্কৃতি (উৎস মানুষ) □ কারেন সিলকউড (মহিলা পাঠাগার) □ নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় (মহিলা পাঠাগার) □ প্রমিথি-উসের পথে

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, ১৫, সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত